আনন্দমেলা

এখন আপনার বাচ্চাকে দিন নিমেষে শক্তি যোগানের পানীয়, যা কমলা লেবুর চমৎকার স্বাদে ভরা।

নতুন গ্লুকন-সি'তে রয়েছে গ্লুকোজ, যাতে আছে চটপট শক্তি যোগানের খাদ্যগুণ, যা আপনার বাচ্চাকে সুস্থ-সবল স্বাস্থ্যে, প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরিয়ে রাখে।

এতে রয়েছে ভিটামিন সি'র ভরপুর গুণ, যা বাচ্চাদের দাঁত, শরীরের হাড় ও টিস্যু সবল গড়ে তুলতে একান্তই দরকার।

একগ্লাস বরফ-ঠাণ্ডা জলে চার চা-চামচ গ্লুকন-সি গুলুন. আর দেখুন কমলা লেবুর চনমনে স্বাদের ভরভাজা কর কি অপূর্ব পানীয় না তৈরী হ'ল। এই চমৎকার পানীয় আপনার বাচ্চাকে দিন রোজই— দু'বার করে।

আর দেখুন, এই নিমেষে শক্তি যোগানের পানীয়ের জন্যে ও কেবলই আবদার করে।

GLL-1174 R

গ্লুকন-সি

আনন্দমেলা

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ □ ২৯ মে ১৯৮৫ □ ১১ বর্ষ ৪ সংখ্যা

ধারাবাহিক উপন্যাস
শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ৯
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২২
গল্প
দুঃখহরা বড়ির শিশি । লীলা মজুমদার ৪
চিনিবাসের খোঁজে । হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩
উপহার । ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া ২৬
খুড়োর কল । সুনীল দাশ ২৯
সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)
কোদণ্ডের টঙ্কার । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৩৫
কবিতা ও ছড়া
ঘুমের মতো রাতের মানে । রত্নেশ্বর হাজরা ৮
জ্যৈষ্ঠের রোদ্দুর । পবিত্র মুখোপাধ্যায় ৮
বিশ্‌শো সালের গ্রীষ্মকালে । প্রসূন মুখোপাধ্যায় ৮
খামখেয়ালি খাম । সুনীতি মুখোপাধ্যায় ৩৪
ভরদুপুরে । ঝুমকা ভাদুড়ী ৩৪
ও, বুঝেছি । হিমাংশু জানা ৩৪
শার্লক হোমসের গল্প
বুটিদার ফেট্টি । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫১
বিজ্ঞানবিচিত্রা
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ১৭
দেখতে একরকম । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯
কালবৈশোখী । সাধনা মুখোপাধ্যায় ৫৭
[illegible]
সে-দিন ভোরবেলা (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ৪৭
সাবুদ ··· মশগুল (অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ৪৭
হিজলি হাইস্কুল । শ্যামলকান্তি দাশ ৫৮
খেলাধুলো
অতন্দ্র অতনু । নৃপতি চৌধুরী ৬২
ইরাক জিতল, ধিক্কার পেল কাতার । রাজা গুপ্ত ৬৩
বিদায়, মারি কানাইয়ান । সুজয় সোম ৬৪
'তেতো' রসগোল্লা । অশোক রায় ৬৫
পেলে যখন গোলকিপার । সম্রাট রায় ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিকস
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২৪, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা ৩২, শব্দসন্ধান ৩২, মজার খেলা ৩৩
হাসিখুশি ৩৩, তোমাদের পাতা ৪৯

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

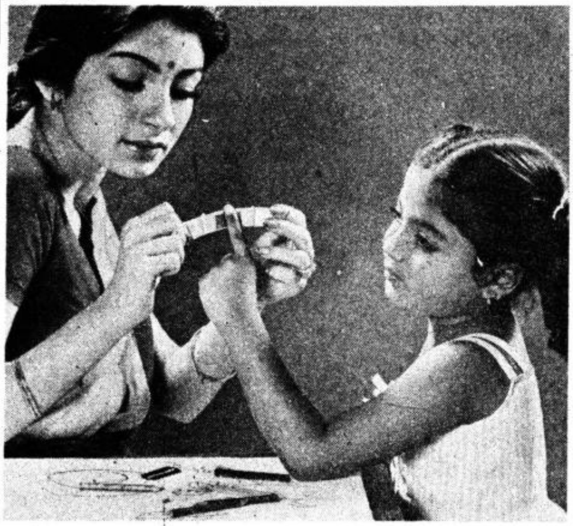

খুব ছোট ঘা'য়েও ধুলো লাগতে পারে
যার ফলে তা দূষিত হতে পারে, কষ্ট বেড়ে যেতে পারে

তাড়াতাড়ি,
ব্যাণ্ড-এড
দিয়ে জায়গাটা ঢেকে দিন

ব্যাণ্ড-এড
উত্তমভাবে সুরক্ষা প্রদান করে
ও দ্রুত উপশম করে

Johnson & Johnson

BAND-AID and JOHNSON & JOHNSON are trademarks of JOHNSON & JOHNSON USA

OBM/4670 BEN

দুঃখহরা বড়ির শিশি

লীলা মজুমদার

জঞ্জালিরা বড় খালের ধারে মাঝিপাড়ায় থাকে। বর্ষায় খালের জল বাড়লে মাঝিরা কিছু পায় না, কিন্তু শুকনো সময়েও যখন সাগর থেকে জোয়ার আসে দিনে রাতে দু'বার করে, তখন সেই নোনা জলের সঙ্গে ছোট-ছোট চিংড়ি কাঁকড়া আর পঞ্চাশ রকম মাছ হুড়মুড় করে খালে ঢুকে পড়ে। মাঝিরা আগের থেকেই জাল পেতে রাখে, তাতে মেলা মাছ পড়ে। তাছাড়া ওদের তলা-চ্যাপ্টা নৌকো খড়, কয়লা, বালি বোঝাই হয়ে জোয়ারের সময়ে উজানে যায়, ভাঁটার সময়ে নামে। খুব একটা দুঃখে-কষ্টে ওদের দিন কাটে না।

তবে জঞ্জালির কথা আলাদা। সে-ও বড় খালের ঘাটের ওপর সুধনকুমোরের বাড়িতে থাকে। তাদের অন্য পাশে একটা বাঁশের সাঁকো আছে, খুব উঁচু। তার তলা দিয়ে নৌকো চলাচল করে। সাঁকো এপার-ওপার করতে পায়ে-হাঁটা লোকদের একটা করে পয়সা দিতে হয়। পারানি আদায় করতে দুদিকে দুই চালাঘরে জঞ্জালির দুই খুড়ো বসে থাকে। আসল খুড়ো নয় অবিশ্যি, পাতানো খুড়ো। সুধনকুমোরকে জঞ্জালি জ্যাঠা বলে ডাকে। ঘাটের ওপর বটতলায় চাটাই পেতে সুধনের হাতে তৈরি চমৎকার সব রঙিন হাঁড়ি সরা নিয়ে কত সময় জঞ্জালি বসে থাকে। যারা পুল পার হয়, কিংবা যাদের নৌকো ঘাটে লাগে, তারা কত সময় দু'-এক পয়সা দিয়ে অমন সুন্দর জিনিস কিনে নিয়ে যায়। সুধন বলে, "সরু পা-টা ছড়িয়ে বসে, থাক্ রে মা, লোকের দেখে দুঃখু হবে, জিনিস কিনবে।"

রেগে যায় জঞ্জালি। "কিনতে হয় এমনি কিনবে। আমরা কি ভিকিরি!" সত্যিকার কেউ নয় সুধনজ্যাঠা। রিক্শ চাপা-পড়া বেদেদের মেয়ের আবার সত্যিকার কেউ থাকে নাকি? তায় আবার বাঁ পা-টাকে টেনে বেড়ায়, জোর পায় না। ওদিকে দৌড়ঝাঁপ খেলার বড় শখ। কুমির-কুমির খেলাতেও অন্যরা ওকে বুড়ি সাজায়। ছুটতে পারে না। কিন্তু দু' হাতে ঝুলে, ডান পায়ে ভর দিয়ে তরতর করে বটগাছের মগডালে চড়ে, তারপর এক লাফে কিপ্টে গাঙ্গুলির হিমসাগরের ডালে! যেমন-তেমন মেয়ে নয় জঞ্জালি। সুধনের মা ওকে খেতে দেয়, নিজের ঘরে শুতে দেয়। দিনে দিনে বুড়ির দৃষ্টি কমে যাচ্ছে, আজকাল জঞ্জালিই ওদের রাঁধাবাড়া করে। ওর রান্নার হাতটি বড় মিষ্টি। কোথায় পেল কে জানে।

চাপা পড়েছিল বড়-রাস্তায়। বেদের দল অমনি সটকে পড়েছিল। খোঁড়া জখম নিয়ে ওরা কী করবে? এমনিতেই পুলিশ-পেয়াদায় বড্ড ভয়। কখন কী জিজ্ঞেস করে বসবে তার ঠিক কী! ছোকরা-বাবুরা ওকে তুলে নিয়ে মুনসিপালের বড় হাসপাতালে দিয়ে এসেছিল। বুড়ো বেদেকেও জোরজার করে সঙ্গে নিয়েছিল। সে বললে, "বাপ-মায়ের নাম কী করে জানব? আঁস্তাকুড় থেকে দয়া করে তুলে এনেছিলাম। তাই ওর নাম জঞ্জালি।"

ভাঙা পাঁজর তিনটে জোড়া লাগল, কিন্তু ঠ্যাংটাতে আর জোর পেল না। হাসপাতালে আবার ক'দিন রাখা যায়? সেখানকার ভাঙা শিশি-বোতল কাপ-ডিশ প্রায় মিনি-মাগনা কিনে আনত পাঁশ-কুড়ুনির মা। সে-ই দয়া করে খোঁড়া মেয়েটাকে এনে সুধনের মায়ের কাছে জমা দিয়ে গেল। বলল,

"ওরে সই, তোর এমনটিই দরকার। চোখে দেখিস্‌নে, ও-ই উনুন ধরাবে, ঘর নিকোবে, শাক বাছবে, পাকা চুল তুলে দেবে। সাতকুলে কেউ নেই ওর, ন্যাংড়া মেয়ে—"

সুধনের মা বলল, "আর বলতে হবে না, দিদি, থাক্ আমার কাছে। এবার দুনিয়ার খপর বলো।"

শিশিবোতলওয়ালি এ-পাড়ায় সে-পাড়ায় এ-হাসপাতালে সে-রেল-ইস্টিশানে ভাঙা শিশিবোতল বাসনপত্রের সঙ্গে সারা বিশ্বের নাড়িনক্ষত্রের খবর মাঝিপাড়ার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিত। নইলে তারা জানবে কোত্থেকে ; সারা দিনমান খাটতে হয়। তারাও খুশি হয়ে তাকে এক ঘটি জল, একমুঠো ঘরে-করা মুড়ি-মুড়কি খাওয়ায়। বুড়ির গল্প শুনতে শুনতে তাদের চোখের সামনে থেকে ঝগড়াঝাঁটি নালা-নর্দমাসুদ্ধু মাঝিপাড়াটা উপে যেত। তার জায়গায় দেখা দিত ফলে ফুলে সবুজ ঘাসে ঢাকা অপূর্ব এক পাহাড়, যেখানে কারও কোনও দুঃখ-কষ্ট নেই। সেইখানে নাকি বুড়ির নিবাস।

জঞ্জালি রেগে বলল, "দুঃখ-কষ্ট নেই তো মাসি, তুমি কেন পায়ে হেঁটে আঁস্তাকুড় ঘেঁটে, লোকের ফেলে দেওয়া নোংরা শিশিবোতল তুলে বেড়াও, তোমারই বা আমার মতো বিশ্রী চেহারা কেন ?"

শিশিবোতলওয়ালি মাসি শুনে অবাক হল, "ওমা ! কী বলে ! আমি যে ধন্বন্তরি কোবরেজের জাদু-শিশি খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাতে সর্বদুঃখহরা দাওয়াইয়ের তলানিটুকু নিশ্চয় রয়েছে। আনমনা হয়ে বুড়ো কখন কোথাকার কোন্ আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে। এ-কথা তার নাতির কাছে শুনেও খুঁজবনি ?"

জঞ্জালি বলল, "তাতে খোঁড়া ঠ্যাং ভাল হয় ? কালো মেয়ে সোঁদর হয় ?"

শিশিবোতলওয়ালি মাসি বলল, "হয় রে হয়। এক ফোঁটা জিবে পড়তে না পড়তে সব অন্যরকম হয়ে যায়। নইলে বিশ বছর ধরে খুঁজছি কেন ?"

সুধনের মা বিরক্ত হল, "কেন মিছে আশা দিস্ রে, সই ? ভগমান যাকে মেরেছে, কেউ তাকে সারাতে পারে না। সে নিজে ছাড়া।" শিশিবোতলওয়ালি মাসি তার দুটো দাঁত বের করে হাসতে লাগল, "যা বলেছিস্ দিদি। তেনার জিনিস তিনিই মারেন। কেউ কিছু করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, ধন্বন্তরির কথা আলাদা !"

এই অবধি বলা হয়েছে কি হয়নি। এমন সময় উঠি-পড়ি করে পাড়ার একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটে এসে কেউ বলে, 'বোমা পড়েছে। বোমা পড়েছে।' কেউ বলে, 'দাঙ্গা লেগেছে !' আবার কেউ বলে, 'সাঁড়াসাঁড়ির বান ডেকেছে ! খালের ধারে বড়ই বিপদ। মোট কথা মোড়ল বলে পাঠিয়েছে, তোমরা যে যার সাধের জিনিসপত্র নিয়ে যেখানে পারো আশ্রয় নাও। আমরা এদিকে ঠেকাচ্ছি। সব মিটে গেলে খপর পাঠাব, তখন সবাই ফিরে এসো।'

গাবি আরও বলল, "সাহস দিতে বলেছে মোড়লজ্যাঠা। তিনশো বছর আগে যখন কলকেতা শহর ছিল না, তখনও এখানে মাঝিপাড়া ছিল। তিনশো বছর পরেও থাকবে।"

ইতিমধ্যে ব্যাটাছেলে যে-ক'জন ছিল, তারা দোকানের ঝাঁপ তুলে, লাঠি - সোঁটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ঘুঁটেকুড়ুনি মাসিও সব দেয়াল খালি করে ঘুঁটেগুলো খুলে নিয়ে, ঘুঁটের

গ্রীষ্মের দিনগুলিতে ...
আপনাকে রক্ষা করবে
ঘামাচি থেকে
সারাদিন রাখবে
তাজা ঝর-ঝরে...
Borocalendula
PRICKLY HEAT POWDER
বোরো ক্যালেনডুলা*
প্রিক্‌লিহিট পাউডার
স্নানের পর সারাগায়ে ছড়িয়ে দিন
বোরো ক্যালেনডুলার সুগন্ধিত পরশ...
HL
এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন
* A PATENT AND PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE OF HAHNEMANN LABORATORY, CALCUTTA - 12.

ধামায় পাহাড়ের মতো বোঝাই করে এসে হাজির ! "ও মা ও কী রে ! উনুন আঁকড়ে এখনও পড়ে আছিস্ ? নড়াই দিবি নে ? ওরে উনুন গেলে উনুন হবে, কিন্তু পেরান গেলে আবার পেরান পাবি কি না সন্দ আছে। সোঁদরবনে নাকি কারা আগুন নাগিয়েছে, তাই বাঘরা সব ইদিকপানে পা বাড়িয়েছে।" শিশিবোতলওয়ালি মাসি বলল, "তা যাবিটে কোথায় ?" বুড়ি বলল,"যকপাহাড়ে ছাড়া আবার কোথায় ? তিন হাজার বছর আগে মেলেচ্ছরা এসে মরা মানুষের খুলি দিয়ে ওই পাহাড় বেনিয়েছিল, তাই তার ত্রিসীমানায় বিপদ ঘেঁষতে পারে না। সেখানে আমগাছেতে নাকি বোল এয়েছে, কলার ঝাড়ে কলা পেকেছে, পাঁচশো বছরের পুরনো চালাঘর এখনও দেঁড়িয়ে আছে। এতটুকু টসকায়নি।"

শিশিবোতলয়ালি মাসি লাফিয়ে উঠল, "তবে ওই বন-পাহাড়ির স্বপ্নই তো আমি দেখি। ওইখানটিতে খোঁজা হয়নি। কোনও পাখিতে ওষুধের শিশি মুখে করে ওই পাহাড়চুড়োতেই ফেলেছে হয়তো।"

অমনি যে যার বাসনপত্র, ছেঁড়া কাপড় চাদর পুঁটলি বেঁধে পা বাড়িয়ে বলল, "তবে চলে চল্, চলে চল্।"

শিশিবোতলওয়ালি চটের থলিটে কাঁধে তুলতে ঝুনুনু-ঝনন্ করে বেজে উঠল। সুধনের মা বলল, "ও কী হল "

বুড়ি বলল, "ঘাটের মাথার কবরেজমশাই যাবার আগে পাঁচটে পয়সা দিয়ে ঠাকুরদার আমলের একটু-একটু গুমো-গুমো গন্ধ ধরা, এক আঙুল দেড় আঙুল ওষুধসুদ্ধু বেচে দিলেন। সে কি ছাড়া যায় ভাই। ও কী দিদি, এখনো উঠলি নে ?"

ঠাকুমা বলল, "চোখে ঝাপসা দেখি, পা নড়বড় করে। আমাকে নিয়ে বিপদে পড়বি। জঞ্জালিটাকে নিয়ে যা, আমায় বাদ দে।" জঞ্জালি অমনি বুড়িকে আঁকড়ে ধরে বলল, "চল, ঠাকুমা, এ ওকে ঠেকো দিতে দিতে দু'জনে যাই। সত্যি যদি ওষুধটে পাই, তোমারও চোখ সারে, আমরও ঠ্যাং সারে। সুধনজ্যাঠা বলেছে, তোমার ৬০ বছরও বয়স হয়নি। আরও ২০ বছর বাঁচবে। আমরা বাইস্কোপ দেখব।"

ফিক্ করে হেসে ফেলল বুড়ি। অমনি রওনা হয়ে গেল দুজনে সবার শেষে। ঘরের কোণ থেকে কালো মাটির ঠাকুরটে ছাড়া কিচ্ছু নিল না। বুড়ি বলল, "নিজেদের নিয়ে যেতে পারলেই ঢের, আর ওই কালো ঠাকুরটে। উনি ইচ্ছে করলেই চাই কী সই-দিদির হারানো ওষুধটেও পাইয়ে দিতে পারেন।"

আর কিছু নেবার কথা বললও না জঞ্জালি। বইবার শক্তি থাকলে তো নেবে। তবে এক্কেবারে কিচ্ছু নেয়নি তাও বলা যায় না। তিনঠেঙো কোলাব্যাংটাকে তো আর ফেলে যাওয়া যায় না। একবার ভাঁটার সময় খালের কাদা থেকে তোলা। হয়তো চিংড়িতে কি কাঁকড়াতে অন্য ঠ্যাংটা খেয়েছে। মাছের জাল থেকে, "এ রাম, ছি ছি," এই বলে সুধনজ্যাঠা ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। খোঁড়া ঠ্যাং দেখে জঞ্জালি তাকে তুলে নিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওকে ফেলে যাওয়াও যায় না, ওর কথা কাউকে বলাও যায় না। একটা ছেঁড়া থলিতে ভরে নিতে হয়েছে, পিঠে ঝুলিয়ে। ছয় মাসে প্রায় একটা আধাবয়সী মুরগির মতো বড় হয়েছে। আর খায় কী ! তবে খাওয়া নিয়ে কাউকে খুঁড়তে হয় না। কিন্তু ব্যাংটার অভ্যাসগুলোও খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল না। তা কী আর করা।

যকপাহাড়ের পথটা খুব সহজ নয়। সবাই এগিয়ে গেল, খালি সুধনের মা আর জঞ্জালি পিছিয়ে পড়তে লাগল। মাঝে-মাঝে শিশি-বোতলওয়ালি মাসি, ফিরে এসে তাড়া লাগায়। আবার এগিয়ে যায়।

এমনি করে সন্ধ্যা লেগে গেল। ব্যাঙের ওজন অসম্ভব ভারী হয়ে উঠল। বড় বেশি নড়াচড়া ধরল। সুধনের মাকে আধ-কোলা করে খানিকটা পাথুরে জায়গা পার করতে হল। ব্যাঙের পিঠে বুড়ির হাত পড়তেই, কিলবিলিয়ে উঠে ব্যাং হঠাৎ গলা ছেড়ে এই প্রথম গ্যাঙর গ্যাঙ ডাক ছাড়ল। বুড়ি আর জঞ্জালি দু'জনেই চমকে গিয়ে বসে পড়ল। জঞ্জালির সঙ্গে খাবার ছিল। একমুঠো দিতেই ব্যাং চুপ করল। তখন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সব কথা বলে ফেলল মেয়েটা, "আমি নিজে খোঁড়া বলে তুমি ছাড়া সবাই আমাকে ঘেন্না করে। ঠাকুমা, আমি কী করে ওকে ফেলে দিই।"

সুধনের মা বলল, "দেখি একবার ওকে।" থলির মুখ খুলতেই গাল ফুলিয়ে ব্যাং বেরিয়ে জঞ্জালির কোলে বসল। সে-দৃশ্য দেখে বুড়ির মুখে হাসি ধরে না। কিন্তু ব্যাঙের গাল ফোলা কেন ? জঞ্জালি তাকে জোর করে হাঁ করিয়ে মুখের মধ্যিখান থেকে হোমিওপ্যাথির শিশির মতো ছোট্ট একটা শিশি বের করল। শক্ত করে কাচের ছিপি আঁটা, সোনালি বড়ি দিয়ে ভরা। কাঁপা কাঁপা হাতে জঞ্জালি তার থেকে একটা বড়ি বের করে ব্যাঙের মুখে দেওয়া মাত্র, দু' মানুষ উঁচু এক লাফ দিয়ে গ্যাঙর গ্যাঙ ডাক ছেড়ে ঝোপঝাপের মধ্যে দিয়ে ব্যাং অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন ভয়ে ভয়ে জঞ্জালি বুড়ির মুখে একটা বড়ি আর নিজের মুখে একটা বড়ি পুরে দিয়ে, শিশিটা ঠাকুমার আঁচলে বেঁধে রেখে বলল, "এই ওষুধের শিশিই খুঁজে বেড়াচ্ছে মাসি আজ কুড়ি বছর ধরে।" এই বলে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে, একটা চাঁপাগাছের তলায় সারা রাত ঘুমিয়ে রইল।

ভোরের আলো ফুটবার আগেই উঠে পড়ে বুড়ি চারদিকে তাকিয়ে অবাক, "ওরে, পৃথিবীটা যে এত সুন্দর তা তো মনেই ছিল না। কালো ঠাকুরের মনে এতও ছিল। দেখি তোর ঠ্যাংটা ?" ঠ্যাং দেখবে কী ঠাকুমা ! জঞ্জালি তার দুটো সমান জোরালো, সমান সুন্দর ঠ্যাং ঠাকুমার সামনে মেলে দিল।

তারপর দু'জনে উঠে পড়ে রোদ ফুটবার আগে পাহাড়চুড়োয় পোঁছে দেখে ওদের খুঁজতে যাবার তোড়জোড় হচ্ছে। কোঁচড় থেকে ওষুধের শিশিটি বের করে শিশিবোতলওয়ালি মাসিকে দিতেই, আনন্দের চোটে সে এক্কেবারে মুচ্ছো যায় আর কি ! তারপর চোখ মুছে বলল, "যাক, আমার জন্মের সাধ মিটেছে। আজ সারাদিন ফলপাকুড় খেয়ে বিশ্রাম। কাল ফেরা। আর ঘোরাঘুরি নয়। বাকি জীবনটা কোবরেজমশায়ের পায়ের কাছে বসে, মিনি-পয়সায় গরিব-দুঃখীদের রোগ সারাব। বিপদ কেটে গেছে।"

ঠাকুমা বলল, "ওঁর পায়ের তলায় কী করে বসবি ? উনি না কাশী যাবেন ?"

মাসি বলল, "কাশীও যা, কলকেতাও তা। কোন্ কালে ওষুধের শিশি গিলে, অ্যাদ্দিন বাদে এই কলকেতার মাটিতেই তো ব্যাং শিশিটে তুলে দিয়েছে। সে কি চাট্টিখানিক কথা !"

ছবি : দেবাশিস দেব

ঘুমের মতো রাতের মানে

রত্নেশ্বর হাজরা

বিছনা-জোড়া ধবধবে এক চাদর
মায়ের গায়ের গন্ধমাখা আদর
রাখলি তাতে না-ধোয়া দুই পা
ভাবলি কেউ-ই দেখতে পাব না !
সাতটা মোটে, সন্ধে সবে বাসি
থামল সবে আফিম-দাদুর কাসি ।
এক্ষুনি তোর ঘুম পেয়েছে নাকি ?
ঘুমের মতো রাত হতে ঢের বাকি ।

ঘুমের মতো রাত মানে কী, জানিস ?
গভীর অন্ধকার—
দরজা আগল দেয়া,
নদীর পাড়ে আর থাকে না খেয়া
বারবাড়িতে ঘুমোয় হারুর গাড়ি
আকাশ তখন পাল্টে পরে শাড়ি ।
ঘুমের মতো রাত মানে কী, জানিস ?
সত্যি সত্যি সত্যি,
বাঁশের সাঁকো নাড়ায় বেম্মদত্যি !
নিমের ডালে বাতাস দোলায় পা ;
ঘুমিয়ে থাকে সবাই,
ঘুমিয়ে থাকেন আমার বাবা-মা !

জ্যৈষ্ঠের রোদ্দুর

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠের রোদ্দুর
রোদের সমুদ্দুর
প্রাণ যায় ;
মগজেতে ভরা ঘুম
ক্লান্তির মরসুম
ঘুম পায় ;
ইসকুল-টিসকুল
সব ফাঁকা বিলকুল ;
ভরসা ?
রিকশার টুংটাং,
খটখটে মাঠ, গাঙ,
বর্ষা ?
সুখ নেই খাদ্যে,
জ্যৈষ্ঠের বাদ্যে
শৈশব ;
ওড়ে ধুলো ঘূর্ণির
মাঠে তিরপুর্নির
ওই সব ;
জ্যৈষ্ঠের রোদ্দুর
রোদের সমুদ্দুর
বৃষ্টি !
নামবে কি এই ঠাঁই !
ঝাপসা যে হল ভাই
দৃষ্টি !

বিশ্‌শো সালের গ্রীষ্মকালে

প্রসূন মুখোপাধ্যায়

বিশ্‌শো সালের গ্রীষ্মকালের
দৃশ্যটা বেশ গোলমেলে,
ছুটছে লোকে ভস্ম মেখে
নিঃস্ব মাথায় ঘোল ঢেলে
সাঁঝ সকালে সূর্য জ্বলে
মাঝরাতেতে অস্ত যায়,
সর্দি-হাঁচি, ঘাম-ঘামাচি
প্রাণ বাঁচানো মস্ত দায় ।
ফাটছে ছাতি, দাঁতকপাটি
লাগছে কারো তেষ্টাতে,
টিকিট কেটে কাটছে লোকে,
এস্‌কিমোদের দেশটাতে ।
উত্তেজনায় পিত্তি চড়ে
বলছে কথা হাত নেড়ে,
ঢালছে গলায় তেঁতুলগোলা
মাংস লুচি ভাত ছেড়ে ।
মেঘালয়ে মেঘ জমেছে,
জমছে মেঘের কারবারি,
ফাট্‌কাবাজের খপ্পরে মেঘ
ভিন্‌দেশেতে দেয় পাড়ি ।

ছবি : অনুপ রায়

কার্তিক মাসেই বৃষ্টি বন্ধ হয়েছিল। এই তল্লাটে বৃষ্টি একবার নামলে আর থামতেই চায় না। পড়ছে তো পড়ছেই। ভিজে ঘাসের বুকে চপচপে জল ছাড়া পথে কোনও বাধা থাকে না বটে, কিন্তু জোঁক বেরোয় কিলবিলিয়ে। চতুর্দিকে চা-গাছের বাগান আর শিরীষ গাছের জঙ্গল ভিজে ঢোল হয়ে জোঁক বুকে নিয়ে বসে থাকে। কখনও আশ্বিনের শেষ, কখনও কার্তিক অবধি ব্যাপারটা গড়ায়।

এখন তো বৈশাখ মাস। অনেকদিন পৃথিবীটা খটখটে। চা-বাগানের রাস্তায় গাড়ি চললেই মাথার চুল সাদা হয়ে যাবে। পেছনে তাকালে বুক ছ্যাঁত করে ওঠে। যেন বিশাল ধুলোর ঝড় তেড়ে আসছে অন্ধকার করে। গুপি ড্রাইভার বলে জানলার কাঁচ খোলা রাখতে। তাতে নাকি ধুলো গাড়িতে না জমে বেরিয়ে যায়। কিন্তু যুক্তিটা মোটেই ভাল লাগে না সায়নের। জানলা দরজা বন্ধ করে গাড়িতে বসে থাকলেও একটা ধুলোটে বাতাস ঢুকে যায় ঠিকই, কিন্তু যেচে ওই ধুলোর ঝড়টাকে ঢোকানোর কোনও মানে হয় না। সুপ্রকাশ কিন্তু গুপিকেই সমর্থন করেন। তিনি যখন গাড়িতে থাকেন, তখন জানলা বন্ধ হয় না। তা যাই হোক, চৈত্রমাস এলেই সারা বাগানটা ধুলোয় ধুলোয় সাদা হয়ে যায়। জলবিহীন পাঁচ মাসের পর মাটি উড়তে থাকে যেন। যদিও এখানে গরম পড়ে না তেমন। তাতেই এই অবস্থা।

সায়নদের বাংলোটা সত্যিই সুন্দর। কাঠ আর সিমেন্ট মিশিয়ে দোতলা বাংলোটায় আধুনিক জীবনের সমস্ত আরামের ব্যবস্থা আছে। বিশাল, সুন্দর করে ছাঁটা, ঘাসের লনের পাশে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। গেটে একজন পাহারাদার সবসময় মজুত। বাগান পেরিয়ে চকচকে বারান্দায় পা দিতেই চমৎকার বসবার চেয়ার-টেবিল নজরে আসবে। সবই চা-গাছ কেটে তৈরি। তাদের ডিজাইন হয়তো পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। সুপ্রকাশের আবিষ্কার ওই সব।

বাংলোটায় আটখানা ঘর। সেগুলো দেখাশোনার ভার দু'জন মানুষের ওপর। এই দু'জনকেই সায়ন জ্ঞান হবার পর থেকে দেখছে। একজন বুধুয়া বুড়ো, কালো, খানিকটা কুঁজো, সাদা চুলের খুব নরম মানুষ। অন্যজন বকুল। বকুলের বয়স মাঝারি। অন্যান্য মদেসিয়া শ্রমিক মহিলাদের থেকে পোশাক এবং সাজগোজে আলাদা। এতকাল ওর ওপরই ছিল সায়নের খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির দায়িত্ব। আর আছে দু'জন দরোয়ান আর একজন ঠাকুর। চা-বাগানের মানুষরা এই বাড়িটাকে বলে বড় বাংলো।

অন্তত সিকি মাইলের মধ্যে কোনও ঘরবাড়ি নেই। সহকারী ম্যানেজারের বাংলো পুব দিকে রেতি নদীর গা ঘেঁষে,

আমাদের কোচ বলেছেন
দম বাড়াবার জন্য পুষ্টি দরকার।
দুধ, মল্টেড বার্লি-এইসব। তাই উনি
রোজ প্র্যাকটিসের আগে নিজের
হাতে আমাদের হরলিক্স খাওয়ান।
হরলিক্স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি
আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে
ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে,
পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে
পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।
Horlicks
The Great Nourisher
নতুন যুগের
নতুন রূপে
পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়
HTD-HMM-8074 BEN

আর স্টাফ কোয়ার্টার্স কিংবা কুলি লাইন ঠিক উত্তরে। বড় বাংলোর গেট পেরিয়ে মিনিট দশেক হাঁটলেই পাহাড় শুরু। এই পাহাড় ছোট থেকে বড় হয়ে এক সময় হিমালয় হয়ে গিয়েছে।

বড় বাংলোর দোতলায় দাঁড়ালে চা-বাগানের অনেকটাই দেখা যায়। সায়ন চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার স্কুল খুলতে এখনও পনেরো দিন বাকি। স্কুল খোলার আগের দিন তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। এইটেই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আগের বার সে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করেছিল। ছুটির শেষে এই চা-বাগান ছেড়ে চলে যেতে কিছুতেই ইচ্ছে করে না। বুকের মধ্যেটা কী রকম থরথর করে ওঠে। সেই সময় বাবাকে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। এই চা-বাগানে ভাল স্কুল নেই বলে সত্তর মাইল দূরের এক পাহাড়ি মিশনারি স্কুলে থেকে পড়াশোনা করতে হয়। সায়ন মাথা নাড়ল। তার বয়স গতবারের চেয়ে এক বছর বেড়েছে। এবার নিশ্চয়ই যাওয়ার সময় তার অতটা কষ্ট হবে না। তা ছাড়া যেতে তো এখনও অনেকদিন বাকি। বোকারাই আগে থেকে মন খারাপ করে বসে থাকে।

এই সময় নীলাম্বরকে দেখতে পেল সায়ন। ধুলোর ঝড় পেছনে রেখে চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে আসছে। নীলাম্বর যত জোরেই ছুটুক, সুপ্রকাশ বসে থাকেন স্থির হয়ে। প্রয়োজনীয় সময়ে তার সামান্য নির্দেশই নীলাম্বরের কাছে অনেকখানি। গেট পেরিয়ে লনে ঢুকে ওপরের দিকে মুখ তুলে সুপ্রকাশ হাসলেন। এইটে খুব ভাল লাগে সায়নের। সে সিঁড়িগুলো টপকে টপকে পথটাকে ছোট করে ছুটে এল লনে, সুপ্রকাশ তখন ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম ধরিয়ে দিয়েছেন বুধুয়া বুড়োর হাতে।

সায়ন আবদারের গলায় বলল, "বাবা, আমি ঘোড়ায় চড়ব!"

সুপ্রকাশ একবার দোতলার দিকে তাকালেন, তারপর মাথা নাড়লেন, "না খোকা, আজ বড্ড ধুলো। তা ছাড়া ছুটে ছুটে নীলাম্বর খুব কাহিল হয়ে পড়েছে। অন্যদিন ; অন্য সময়। সোনা আমার।" ওঁর হাতটা ছেলের মাথায় আলতো ছোঁয়ামাত্র টেলিফোনটা বেজে উঠল। বারান্দায় ঝোলানো রিসিভারের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। সায়নের ঠোঁট দাঁতের তলায় চলে এল। সে জানে অন্যদিন অন্য সময় আর একটি অসুবিধে সামনে এসে দাঁড়াবে। বাবা কখনওই তাকে নীলাম্বরের পিঠে চেপে বাইরে ঘুরতে যেতে বলবেন না। অন্তত মায়ের ওই ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর বাবা ইচ্ছে থাকলেও 'হ্যাঁ' বলতে পারেন না।

ফ্যাক্টরি থেকে জরুরি খবর এসেছিল। সুপ্রকাশ চটজলদি জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। নীলাম্বরকে ব্যবহার করা হয় চা-বাগানের সরু পথে ছুটে যাওয়ার জন্যে অথবা রেতি নদীর গা ধরে পাহাড়ে ওঠার প্রয়োজনে।

চা-বাগান এদেশে তৈরি করেন ব্রিটিশরা। সেই সময় কিছু স্কচ সাহেবও এঁদের সঙ্গে জুটে যান। ডুয়ার্স আর আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নামমাত্র মূল্যে পেয়ে গেলেন ওঁরা চা-বাগান তৈরির জন্যে। তখন চা-শিল্পে কোনও ভারতীয় আসেননি। কিংবা বলা যায়, ভারতীয়রা যাতে এই লাভজনক ব্যবসায়ে না আসেন তার জন্যে নানান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হত। কিন্তু সত্যিকারের উদ্যোগী মানুষকে তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না। জলপাইগুড়ির ঘোষ এবং রায় পরিবারের কর্ণধাররা সেই অসাধ্যসাধন করেছিলেন। ব্রিটিশরা যে-সমস্ত জমি পাথুরে এবং চা-চাষের পক্ষে কষ্টসাধ্য বলে বাতিল করেছিলেন, তাতেই তাঁরা সোনা ফলান।

সুপ্রকাশের চতুর্থ পূর্বপুরুষ চারুপ্রকাশের হাতে তৈরি এই বাগান। এই মুহূর্তে সুপ্রকাশ যে-কোনও দক্ষ ম্যানেজারের মতনই উৎপাদন ও ব্যবসার কাজ দেখাশোনা করেন। এর জন্যে তাঁকে খাটতে হয় খুব। দিন রাতের কোন সময় তাঁকে কতটা বিশ্রাম দেবে, তা তিনি জানেন না। সায়ন দেখল, দূরে ধুলোর ঝড়টা বাবার সঙ্গেই এগিয়ে যাচ্ছে। নীলাম্বর তার সামনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। বুধুয়াও নড়ছে না। সে যদি লনের মধ্যে চড়ে, তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু নীলাম্বরের পিঠে চেপে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করার কোনও মানে আছে? লাগাম মুঠোয় চেপে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেওয়ায় যে কী আরাম!

সায়ন এবার চোখ তুলতেই মিষ্টি হাসিটাকে দেখতে পেল। দোতলার বারান্দার গ্রিলের ফাঁকে কুমুদিনীর উজ্জ্বল মুখ। ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। সায়ন আবার দৌড়োল। একটুও না থেমে মায়ের হুইল চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "জানো, বাবা আজও আমাকে নীলাম্বরের পিঠে চড়তে দিল না।"

সামান্য মেঘ বুঝি জমল কি জমল না, কুমুদিনী শান্ত গলায় বললেন, "হ্যাঁ রে, বাড়িতে দুটো গাড়ি আছে, ছোট সাইকেল আছে, ওগুলোয় চড়তে বুঝি তোর একটুও ইচ্ছে করে না, না?"

সায়ন মাথা নাড়ল, "না। নীলাম্বর যখন টগবগিয়ে ছোটে তখন কীরকম থ্রিল লাগে। তা ছাড়া জিপ কিংবা কার তো সব জায়গায় পাওয়া যায়, ঘোড়া তো কোথাও পাব না।"

কুমুদিনী ছেলের ডান হাত ধরলেন, "তুই চাইলে যে-কোনও জিনিস ঠিক পেয়ে যাবি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস, কাউকে দুঃখ দিয়ে কিছু পেতে নেই। সেই পাওয়ায় কোনও সুখ থাকে না।"

"নীলাম্বরের পিঠে ঘুরে বেড়ালে বাবা কেন দুঃখ পাবে?"

"তোর বাবা ভয় পান খোকা। নীলাম্বরের পিঠ থেকে পড়ে আমি সারা জীবন..." কুমুদিনী ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলালেন।

সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সায়ন। মায়ের সুন্দর মুখটা দু'হাতে ধরে কাঁপা গলায় বলল, "তুমি ভাল হয়ে যাবে মা। বাবা বলেছে আর একটা অপারেশন হলেই তুমি হাঁটাচলা করতে পারবে।"

কুমুদিনী ছেলের দুটো হাত মুঠোয় নিলেন, "কেউ তো আমাকে নীলাম্বরের পিঠ থেকে ঠেলে ফেলেনি, আমার ভাগ্যটাই এমন ছিল। নালাটা পার হবার জন্যে নীলাম্বর যেই লাফ দিল, অমনি মাথাটা ঘুরে গেল, আর ছিটকে পড়লাম পাথরের ওপর। কেউ ছিল না আশেপাশে। কেউ দ্যাখেনি আমাকে পড়তে। কিন্তু আমি পড়ে যাওয়ার পর ঘোড়াটা বাংলো অবধি দৌড়ে এসে এমন চিৎকার করতে লাগল যে, বুধুয়ারা ছুটে গেল আমায় খুঁজতে। খুঁজে যে তক্ষুনি পেয়েছিল সেটাও আমার ভাগ্য। খোকা, আমি জানি, আর কখনও

হাঁটতে পারব না। কিন্তু তাতে আমার একটুও খেদ নেই। তুই হাঁটছিস, দৌড়োচ্ছিস, এতেই তো আমার সুখ। তোর হেঁটে বেড়ানো মানেই আমার হাঁটাচলা।"

এই সময় বকুল বেরিয়ে এল দুটো প্লেটের মধ্যে একটা গ্লাস চেপে। ওটা গায়ের জোর বাড়ানোর কোনও টনিক, এটা সায়ন জানে। জিনিসটা দেখামাত্র মায়ের মুখ কালো হয়ে গেল। ইদানীং ওষুধ খেতে চান না কুমুদিনী, বলবর্ধক এই সব টনিক তো নয়ই। সায়ন কাছে থাকলে মায়ের আদেশে অর্ধেক গিলতে হয় তাকে। বকুলের সঙ্গে কুমুদিনীর সংলাপ যখন শুরু হয়েছে, তখন সায়ন পা টিপে সরে এল আড়ালে। বকুল আজ কোনও কথা শুনবে না, মাকে ওটা খাওয়াবেই।

বাড়িটার পেছনে একটা ছোট্ট বাগান আছে। শীত চলে গেছে, কিন্তু ফুলগুলো এখনও ছড়িয়ে আছে গাছে-গাছে। অজস্র মৌমাছি পাক খাচ্ছে বাগানটায়। মৌমাছিগুলো বোধহয় সায়নকে চিনে নিয়েছে এরই মধ্যে। বন্ধুর মতো ব্যবহার করে তারা। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা সাদা পাথর অনেকটা মোড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে। ওখানে বসলে খুব ভাল লাগে সায়নের। মাথার ঠিক ওপরেই ইউক্যালিপটাস গাছের ডাল থেকে পাতা ঝরছে দুলে দুলে। সেই পাতায় একটা তীব্র গন্ধ এখানকার বাতাসে ভাসে। আর কান পাতলেই অন্তত সাতরকমের পাখির ডাক শোনা যাবে। চেনা ডাকের সঙ্গে অচেনা গলা মিশে গিয়ে একটা অদ্ভুত জগৎ তৈরি করে দেয়।

অথচ তাকে এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে মিশনারি স্কুলের হোস্টেলে। সেখানে প্রতিটি ঘণ্টা হিসেব করে ব্যবহার করতে হয়। পড়াশুনো, ঘুমোনো, খেলা—সবই ফাদারদের রুটিনমতো করতে হবে। ছুটিতে বাড়িতে আসার পর সায়নের প্রত্যেকবারই মনে হয় যদি তার স্কুল আর না খুলত, সে যদি চিরকাল এখানেই থেকে যেতে পারত, তা হলে তার চেয়ে খুশি আর কেউ হত না।

হঠাৎ মৃদু শব্দটা কানে আসতেই সজাগ হয়ে গেল সায়ন। খুব সতর্ক পায়ের আওয়াজ ঠিক তার ডান দিকে। সে ধীরে-ধীরে মুখ ফেরাতেই খরগোশের শরীরটাকে দেখতে পেল। খুবই বাচ্চা খরগোশ ওটা। সাধারণত খরগোশের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় না। এটা বোধহয় এখনও সেসব কায়দা শেখেনি। খরগোশটাও একমনে সায়নের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর সেই মুহূর্তেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। খরগোশটার ঠিক পেছনে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে একটা কুচকুচে কালো সাপ। বেশ মোটা এবং লোভী এবং শব্দহীন। খরগোশটা টেরও পাচ্ছে না যে, তার মৃত্যু অত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সময় কয়েকটা কাক এমন কর্কশ গলায় মাথার ওপর ডেকে উঠল যে, খরগোশটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সাপ তাকে তুলে নিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

এবার চমক ভাঙল সায়নের। সে পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল, "সাপ, সাপ! তাড়াতাড়ি এসো, সাপ খরগোশ ধরছে।"

চৌকিদার, গুপি ড্রাইভার আর বুধুয়া সর্দার ছুটে এসে যখন সায়নের পাশে দাঁড়িয়েছে, তখন সাপটার কোনও চিহ্ন নেই। গুপি ড্রাইভার লম্বা লাঠি দিয়ে ঝোপটাকে পিটিয়েও তাদের হদিস না পেয়ে বলল, "ঠিক দেখেছ তো ছোটাসাহেব? এখনও জল নামেনি, সাপের ঘুম ভাঙল কী করে?"

তাই শুনে বুধুয়া-বুড়ো মাথা নাড়ল, "এ হল কালসাপ। সবকালে থাকে। এই বাংলোর পাহারাদার। আজ পর্যন্ত এই বাংলোয় কোনও চোর ঢোকেনি ওই সাপের জন্যে। একা নয়, ওর এক স্যাঙাত আছে এই বাংলোয়। ছোটাসাহেবের কপাল ভাল যে, ওর দর্শন পেল।"

তারপর সবাই মিলে নানান প্রশ্ন শুরু করল। কেমন দেখতে, কতটা কালো, ফণা যখন তুলেছিল, তখন মাথায় কিছু আঁকা ছিল কি না। সায়নের এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে খুব ভাল লাগছিল। সে যা দেখেছিল, তার সঙ্গে যা দেখেনি তাও জবাব দেবার সময় মিশে যাচ্ছিল। এবং সেইসব কথা শোনার সময় শ্রোতাদের দারুণ প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। বুধুয়া-বুড়ো হাত জোড় করে বিড়বিড় শুরু করল। বাচাল গুপি ড্রাইভারও চুপচাপ হয়ে গেল। যেন এইমাত্র ওই কালো সাপটা বাসুকির চেহারা নিয়ে সামনে দাঁড়াবে এই রকম আবহাওয়া তৈরি হচ্ছিল। আর তখনই দোতলার বারান্দা থেকে বকুলের ডাক ভেসে এল, "আরে এই বুধুয়া, মেমসাব ডাকছেন। ছোটাসাহেবকেও আসতে বল।"

পুরো দলটা যেন খানিকটা অনিচ্ছায় এগোতে লাগল। কালসাপ যদি আবার দর্শন দেয় এই আশা ছিল ওদের, এখান থেকে চলে গেলে সেটা হারিয়ে যাবে। কিন্তু মেমসাহেবের ডাক উপেক্ষা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সায়ন ততক্ষণে কালসাপ সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য জেনে নিয়েছে। এইসব কথা মায়ের সামনে বলতে হবে বলে সে কিছুটা উত্তেজিত।

হুইল চেয়ারে বসে কুমুদিনী জিজ্ঞেস করলেন, "সাপ কে দেখেছে?"

পিছনে পরিচারকদের দল, উদ্ভাসিত মুখে সায়ন জবাব দিল, "আমি।"

"কী রকম সাপ?"

"কালো মোটা, খুব গম্ভীর।"

"গম্ভীর? গম্ভীর কী করে বুঝলে?"

"চুপচাপ খরগোশটাকে তুলে নিয়ে মিলিয়ে গেল যে।"

"সাপটা চতুর বলেই তার শয়তানি তোমরা ধরতে পারনি। কিন্তু বাড়ির মধ্যে সাপ ঘুরে বেড়াবে এটা তো ভাল কথা নয়।"

সায়নের শয়তানি শব্দটা একদম পছন্দ হচ্ছিল না। সে বলল, "কালসাপ কখনও শয়তান হয় নাকি? তুমি জানো না।"

"কালসাপ?"

"হ্যাঁ। যে-সাপ অনন্তকাল ধরে এই বাড়ি পাহারা দেয়।"

"অনন্তকাল? মূর্খের মতো কথা বোলো না। কোনও প্রাণীই অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে না। সাপেরও নির্দিষ্ট আয়ু আছে। তা ছাড়া এই বাড়ি পাহারা দেবার চাকরি ওই সাপকে কেউ দেয়নি। মূর্খলোকেরাই কল্পনায় বাস করতে ভালবাসে। সাপ সবসময় সাপই। তার সম্পর্কে গম্ভীর-টম্ভির শব্দ না ব্যবহার করে জঙ্গল ছেঁটে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দাও তোমরা। যাও।"

সায়ন দেখল তার পেছনে দাঁড়ানো কালো মুখগুলো বিমর্ষ, হুকুমটাতে কেউ খুশি হয়নি। (ক্রমশ)

ছবি: অনুপ রায়

চিনিবাসের খোঁজে

হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাল করে তাকিয়ে দেখল তাতু, না, চিনিবাস এখনও আসেনি। রন্টু বুলান ঝিমলিরা ওদিকে দৌড়োদৌড়ি করছে। মিতুলদিরা গল্প করতে করতে আসছে এদিকে। নকুলদানাওয়ালা এলে ওরা কি আর থাকত ওখানে !

লোকটার চেহারা মনে পড়তেই হাসি পেল তাতুর। দেখতে যেন ঠিক সার্কাসের জোকার। গায়ে সেই আদ্যিকালের ছেঁড়াখোঁড়া একটা ময়লা আলখাল্লা। মাথায় রঙচঙে কাগজের চোঙা টুপি। কাঁধে তালিমারা ঝোলানো থলি, সবাই জানে তাতে আছে নকুলদানার প্যাকেট। পায়ে থাকে ক্যাম্বিসের জুতো, রঙটা বোধহয় কোনও এককালে সাদাই ছিল—দুপাশ দিয়ে দুটো বুড়ো আঙুল সব সময়েই উঁকি মারছে। আর কাঁধের ওপর চুপটি করে বসে চোখ পিট-পিট করছে চিনিবাস।

চিনিবাসকে চেনে না এমন কেউ আছে নাকি এখানে ! পার্কের গেট ঠেলে একবার ঢুকলেই হল লোকটা, রাজ্যের ছেলেমেয়ে সব দৌড়ে আসবে। লম্বা-লম্বা সরু-সরু ঠোঙায় নকুলদানা কিনবার জন্যে একেবারে চেঁচামেচি, ঠেলাঠেলি, হৈ-হৈ কাণ্ড। সে কি ওই নকুলদানা খাবার জন্যে, নাকি চিনিবাসের হাত থেকে সেটা পাবার লোভে !

তবু কাকামণি ভুরু কুঁচকে বলেন, "চিনিবাস ? সেটা আবার কে ? তাকে তো চিনি না।"

"তুমি যেন কী," তাতুর রাগ ধরে যায়, "রোজই তো আসে লোকটা—দেখনি নাকি কোনওদিন ?"

"আরে লোকটাকে দেখব না কেন, কী পেল্লায় হাঁক ছাড়ে একখানা !"

"তবে ?"

"তবে আবার কী ? ওর নাম তো চিনিবাস নয় !"

"ওর নাম চিনিবাস কেন হবে ! চিনিবাস তো বসে থাকে ওর কাঁধে !"

"তাই বলো !" কাকামণি এবার ফিক করে হেসে ফেলেন, "ছোট্টখাট্ট লেজবিশিষ্ট ওই হনুমানের ছা ?"

"আহা ! ও হল আমাদের বন্ধু," তাতু কী করে যে বোঝাবে ভেবেই পায় না, "কেমন মজা করে আমাদের সঙ্গে দেখনি তো।"

"করে বুঝি ? তাহলে তো দেখতেই হচ্ছে একদিন !"

তা, সেইজন্যেই তো পার্কে আজ কাকামণিকে টেনে নিয়ে এসেছে তাতু। এমন মজার ব্যাপারটা না দেখালে চলে ! কাকামণি ঠিকই বলেছে, এসেই লোকটা কেমন অদ্ভুত গলায় একটা আওয়াজ ছাড়ে, "নকুড়দানা—চার-চার আনা—" তারপর যেই এসে ওরা ভিড় করে চারদিকে, যার হাতে পয়সা দেখে তার দিকে তাকিয়েই হাসে। এমনিতেই কুতকুতে চোখ, হাসলে একেবারেই বুজে যায়। সেইরকম করেই বলে, "আয় তো আমার চিনিবাস—"

ডাকটি একবার শুনলে হল, চিনিবাস অমনি ওর গা বেয়ে নেমে আসবে নীচে। থলি থেকে বার করে একটি প্যাকেট, এগিয়ে দেয় ওদের দিকে। হাত থেকে পয়সাটা মুঠোয় নিয়ে একবার হাত ঘুরিয়ে দেখে, তারপরই ফেলে দেয় ওর পকেটে। এমনি চলে বেশ কিছুক্ষণ, তারপরই আবার তড়াক করে উঠে পড়ে চিনিবাস ওর কাঁধে। আবার একখানা আওয়াজ ছেড়ে লোকটা বেরিয়ে যায় পার্ক থেকে। অন্য কোথাও যায় হয়তো—চিনিবাসকে আরও অনেকেই নিশ্চয়ই

স্নেহ

নিমেষে গুলে যায় এমন স্কীমড্ মিল্ক পাউডার

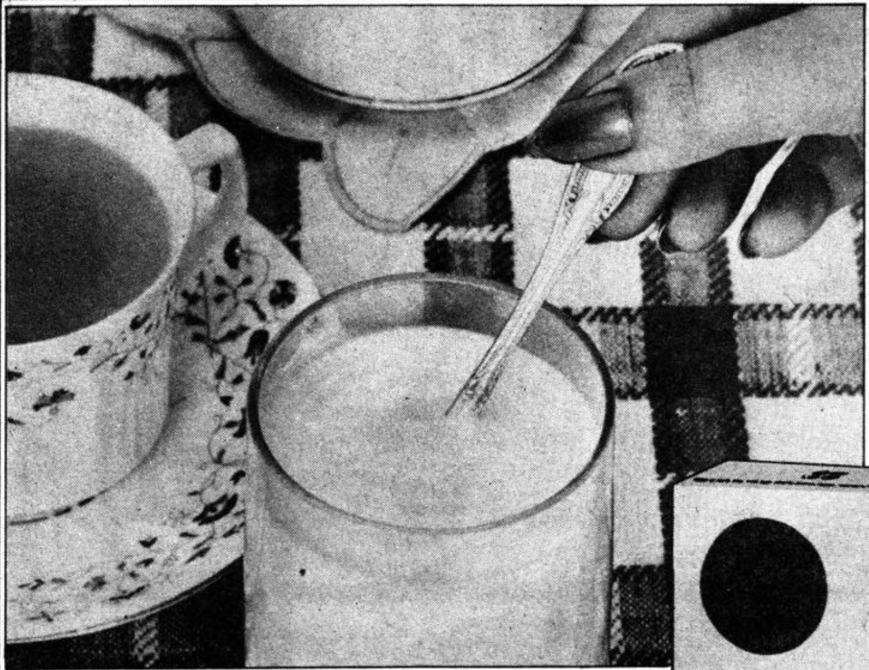

স্নেহ স্কীমড্ মিল্ক পাউডার। শুধু জলে দিলেই হ'ল...নিমেষে গুলে যায়! গরম জল দরকার নেই। দলা পাকায় না। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। পুষ্টিতে ভরা কম চর্বিযুক্ত এই দুধ সরাসরি ব্যবহার করুন— চা বা কফি, দই বা মিষ্ঠান্ন বানানোর জন্যে।

স্নেহ স্কীমড্ মিল্ক পাউডার। পুষ্টিগুণে ভরা এই সুবিধাজনক প্যাক হাতের কাছে রাখুন।

মধ্য প্রদেশ দুগ্ধ মহাসংঘের উৎকৃষ্ট ডেয়ারী উৎপাদন

ভালবাসে ওদের মতো !

কিন্তু আজ এখনও ও আসছে না কেন ! তাতু রাস্তার দিকে তাকাল। চিনিবাস না এলে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। বলতে গেলে ইস্কুল থেকে ফেরার পরই ছটফট করে পার্কে আসার জন্যে। কতদিন বকুনি খেতে হয়েছে মা'র ! মা বলেন, "রোজই তোর খিদে থাকে না, তাই না ? ওসব আমি খুব বুঝি। চিনিবাস তোমার পালিয়ে যাচ্ছে !"

না, পালিয়ে অবশ্য যায় না কোনওদিন—সেই ভরসাতেই তো আনা কাকামণিকে। কিন্তু আজ হল কী চিনিবাসের ! এতক্ষণ বসে আছে, অথচ—

ভাবনাটা আর শেষ করা হল না, তার আগেই পার্কের বাইরে চোখ পড়ে গেছে তাতুর। রাস্তার ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

"এসেছে কাকামণি, এসেছে !"

কাকামণির হাত ছেড়ে দিয়ে একছুটে একেবারে পার্কের গেট। লোকটার মুখেও এখন সেই চোখ-বন্ধ-করা হাসি। এপারে আসতে আসতেই হাঁক ছেড়েছে, "নকুড়দানা—চার-চার আনা—নকুড়দানা—"

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটে গেল ওই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা !

ট্যাক্সিটা অবশ্য সজোরে ব্রেক কষেছিল। ক্যাঁ—চ করে একটা বিকট আওয়াজ তুলেই সেটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল থমকে। কিন্তু তার আগেই রাস্তার ওপাশে ছিটকে পড়ে গেছে লোকটা।

ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল তাতু। কাকামণিও ততক্ষণে এসে পড়েছেন ওর পাশে। দেখতে দেখতে ছুটে এসেছিল সব লোকজন। কাকামণি তাদের সরিয়ে তাড়াতাড়ি লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাকামণি তো আবার ডাক্তার, নিজের একটা নার্সিং হোমও আছে। লোকটাকে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে বললেন, "বিশেষ কিছু হয়নি মনে হচ্ছে—ভয়েই বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। তবে ডান পা'টা একটু দুমড়ে গেছে দেখছি।"

যে-সব লোক জড়ো হয়েছিল তারা এবার ট্যাক্সিওয়ালার ওপর চড়াও হবার উপক্রম করল। বেগতিক দেখে কাকামণি ট্যাক্সিওয়ালাটাকেই ডাকলেন, বললেন, "চলো তো ভাই, একটু নার্সিং হোমে পৌঁছে দাও তো লোকটাকে।"

ট্যাক্সিওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে শুইয়ে দিল পেছনের সিটে। কাকামণি বললেন, "চল তাতু, নার্সিংহোম থেকে ঘুরে আসি একটু।"

এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না, ট্যাক্সি যখন চলতে শুরু করেছে তাতুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল চিনিবাসের কথা। আশ্চর্য, লোকটা গাড়িতে ধাক্কা খাওয়ার পর চিনিবাস যে কোথায় গেল একেবারেই লক্ষ করেনি তো ! ঘাড় ঘুরিয়ে তাতু বলল, "ও কাকামণি, চিনিবাস কোথায় গেল ?"

"কে চিনিবাস ? ও, সেই হনুমানের ছা ! ঠিক আছে, নার্সিং হোম থেকে ফেরার পথে ওকে এখানে এসে খুঁজলেই হবে।"

পরে কি আর ওকে পাওয়া যাবে নাকি ! কথাটা মুখে এসে গিয়েছিল, কিন্তু কাকামণির গম্ভীর মুখ দেখে সেটা আর বলতে সাহস করল না। মনে মনে কাকামণির ওপর ভীষণ রাগ করতে লাগল, আর একটু দেরি করে চিনিবাসকে ধরে নিয়ে গেলে কী এমন ক্ষতি হত শুনি !

নার্সিং হোমে যাবার একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এল লোকটার। কাকামণি যা বলেছেন ঠিক তাই, ডান পা'টা আর নাড়তে পারছে না, যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তবু তার মধ্যেই হঠাৎ একবার এধার-ওধার তাকিয়ে নিয়ে বলল, "আমার চিনিবাস ?"

তাতু বলল, "চিনিবাসকে তো আমরা আনিনি।"

"তাইলে ?" ফ্যালফ্যাল করে খানিক চেয়ে হঠাৎ কাকামণির দিকে হাতজোড় করে লোকটা বললে, "আমার চিনিবাসরে এনে দ্যান বাবু—ওকে ছাড়া আমি বাঁচবনি।"

"ভাল বিপদ হল দেখছি," কাকামণি গজগজ করতে লাগল, "নিজে মরতে বসেছিলে, তুলে নিয়ে এলাম—এখন আবার চিনিবাসের বায়না। ওকে আমি এখন পাব কোথায় ?"

"চিনিবাস আমার ওখেনেই আছে বাবু ! আমার থলি যে পড়ে গেছে বাবু ওখেনে—ওই থলি ছেড়ে ও নড়বেনি। যান বাবু—"

কাকামণি বিরক্ত হয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তাতু বলে উঠল, "চলো না কাকামণি, ওখানে গিয়ে একবার আমরা খুঁজে আসি ওকে !"

ইচ্ছে ছিল না, বুঝতে পারল তাতু, কিন্তু তাও কাকামণি উঠেই পড়লেন। লোকটার চিকিৎসা কীরকম হবে নার্সিং হোমের সিস্টারদের সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দিয়ে বললেন, "চলো, তাহলে চিনিবাসকেই খুঁজি গিয়ে।"

ফের যখন পার্কের সামনে এল ওরা, তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। আলো-টালো জ্বলে গিয়েছে রাস্তার। কিন্তু চিনিবাস কই ! যেসব লোকজন জমেছিল তখন, তারা কেউ কোথাও নেই। বণ্টু, বুলান, মিতুলদি—ওদেরও কাউকে দেখা যাচ্ছে না পার্কে। লোকটার থলিটাই বা কোথায়—এইখানে পড়ে গেছে বলল যে !

"কী হবে কাকামণি !" তাতুর গলা ভার, "চিনিবাস তো নেই !"

"নেই তো আর কী করবি বল, বাড়ি চল।"

"কিন্তু চিনিবাসের কী হবে ?"

"হবে আবার কী, কেউ নিয়ে-টিয়ে গেছে হয়তো !"

"ইশ্‌, কারও কাছে ও যাবেই না ! ও এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।"

"তাহলে কাল সকালে এসে খুঁজব—এই অন্ধকারে কি আর খুঁজে পাওয়া যায় !"

ওরা কথা বলছিল দত্ত স্টোর্সের সামনে দাঁড়িয়ে। লম্বা চুলওয়ালা যে ছেলেটা দোকানের জিনিস-টিনিস দেয়, সে বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, "আপনিই নিয়ে গেলেন না সেই লোকটাকে ?"

কাকামণি বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন বলো তো ?"

"ওর এই থলি আর টুপিটা পড়ে ছিল রাস্তায়, আমি রেখে দিয়েছি। নিয়ে যাবেন ?"

তাতু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আর চিনিবাস ?"

ছেলেটা প্রথমে বুঝতে পারেনি, তারপর আমতা-আমতা করে বলল, "একটা বাচ্চা হনুমানের কথা বলছ ?"

"হ্যাঁ, ওর নামই তো চিনিবাস। তুমি দেখেছ ?"

"হুঁ, থলিটার পাশেই তো বসে ছিল—তা সকলে মিলে তাড়া দিল, ওটাও তরতর করে উঠে গেল পাশের বাড়ির ছাদে। তারপর তো আর দেখিনি ওটাকে।"

যাঃ ! তাতুর মন খারাপ হয়ে গেল। চিনিবাসকে ছেলেটা দেখেছে শুনে ভেবেছিল, থলি আর টুপির মতো চিনিবাসকেও বোধহয় নিজের কাছে রেখে দিয়েছে ও।

কাকামণি জিনিস দুটো হাতে নিয়ে বললেন, "কী রে তাতু, চল এবার।"

"দাঁড়াও কাকামণি, একবার ডেকে দেখি," তাতু ফুটপাথ থেকে ওপরে মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "আয় তো আমার চিনিবাস।"

কোথায় কে ! বরং রাস্তার দু-একটা লোক যেতে যেতে তাতুর দিকে একবার অবাক হয়ে তাকাল। কিন্তু তাতুর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আবার চিৎকার করে উঠল, "আয় তো আমার চিনিবাস—"

বার-চারেক এইরকম ডাকাডাকির পর কাকামণি প্রায় ধমক দিয়েই বলে উঠল, "আঃ, কী হচ্ছে কী ! বললাম না সকালবেলা এসে খুঁজব। চল তো এখন বাড়ি !"

অগত্যা তাতুকে থামতে হল। কিন্তু চোখে ওর জল এসে গেছে ততক্ষণে। চিনিবাসকে যদি না পাওয়া যায় ! চিনিবাস না থাকলে বিকেলের খেলাটাই যে মাটি হয়ে যায় !

কাকামণির নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে উৎসাহে টগবগ করে ফুটছিল তাতু। নাঃ, প্ল্যানটা কাকামণি দারুণ করেছেন। এবার চিনিবাসকে আসতেই হবে, যেখানেই থাকুক।

আসলে সকালেও যখন ডাকাডাকি করে চিনিবাসকে পাওয়া গেল না, লোকটাকে গিয়ে বলতেই হল সে-কথা। পায়ের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, এক্স-রে করে বোঝা গিয়েছে হাড়ই ভেঙেছে পায়ের—কিন্তু চিনিবাসকে না পাওয়ার দুঃখে সে অনেক বেশি কাতর হয়ে পড়েছিল। বারবার বেশ জোর দিয়ে বলছিল, "ও যে আমার টিনিং-দেওয়া বাচ্চা বাবু, ডাকলে পরে আসবেনি তা কি হয় !"

বারবার ওই একই কথা শুনে বিরক্ত হয়ে কাকামণি বলেছিলেন, "তাহলে যাও না—ডেকে নিয়ে এসো না তোমার চিনিবাসকে।"

লোকটা থমকে গিয়ে বলেছিল, "রাগ করবেননি বাবু, এখন কি আমার হাঁটার খ্যামতা আছে ! কিন্তু বাবু, চিনিবাসরে তো আমি চিনি—ডাক দিল্লে সে যেখানেই থাক, ছুট্টে চলে আসে। এখন সে কম্‌নে পালাবে বলুন ?"

কাকামণি বলছিলেন, "তুমি বুঝতে পারছ না, যদি সে ওখানে কোথাও থাকেও—আমাদের ডাকে সে আসবে কেন ?"

লোকটা তবু নাছোড়বান্দা। ওকে বোঝাতে গিয়েই মতলবটা মাথায় এসেছিল কাকামণির। আর সেইমতো বিকেলে টেপ-রেকর্ডারটা নিয়ে এসেছিলেন বাড়ি থেকে। লোকটা তো শুনে হেসে উঠেছিল প্রথমে। বলেছিল, "আমি এখান থেকে ডাক পাঠালেই চিনিবাস শুনতে পাবে ?"

তাতু অধৈর্য হয়ে বলেছিল, "তোমাকে কাকামণি যা বলছে তাই করো না ! জোরে জোরে ডাকো তোমার চিনিবাসকে—যতবার তোমার খুশি।"

প্রায় মিনিট-দুয়েক ধরে লোকটার গলা টেপ করেই বেরিয়ে এসেছে ওরা। সঙ্গে ওর থলি আর টুপিটাও নিতে ভোলেনি।

পার্কের সামনে এসে যখন পৌঁছল ওরা, কালকের মতো আজও সন্ধে হয়ে এসেছে। রাস্তার আলো তখনও জ্বলেনি। ভাল করে দেখতে বোঝা গেল, লোডশেডিং চলছে। তাতে আরও ভালই হল, কাকামণি লজ্জার হাত থেকে বাঁচলেন। তাড়াতাড়ি মাথায় সেই রঙচঙে কাগজের টুপিটা পরে নিলেন।

এত দুঃখেও হাসি চাপতে পারল না তাতু। ইশ্, কী দেখাচ্ছে কাকামণিকে—ঠিক যেন সেই নকুলদানাওয়ালা। ভাগ্যি হাসিটা শুনতে পাননি কাকামণি ! কাকামণি তখন থলির মধ্যে হাত ভরে প্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে থাকা রেকর্ডারটা চালু করতে ব্যস্ত। কয়েক মুহূর্ত পরেই গাঁক-গাঁক করে বেজে উঠেছে লোকটার গলা, "আয় তো আমার চিনিবাস !"

দত্ত স্টোর্সের ছেলেটা মুখ বাড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল বোধহয়। রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছিল তারাও তাকাচ্ছিল ওদের দিকে। কিন্তু তাতুর সেদিকে নজর ছিল না। ওর চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাড়ির ছাদে, এপাশে-ওপাশে।

কিন্তু কোথায় কী ! অন্ধকার হলেও একেবারে কিছু দেখা যাচ্ছে না এমন তো নয়। চিনিবাস যদি কোথাও লাফ দিয়ে পড়ত, তাতু কি বুঝতে পারত না তা ! অস্বস্তির জন্যেই হোক আর যে কারণেই হোক, কাকামণি ওইভাবেই ঘোরাফেরা করছিলেন চারদিকে। টেপ-করা অংশটা যখন শেষ হয়ে এসেছে, তাতুর মনটা ভীষণ ভীষণ খারাপ হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে গেল।

একেবারে হঠাৎই জিনিসটা চোখে পড়ল তাতুর ! পার্কের রেলিংয়ে ওটা কে ? চিনিবাস না ?

আনন্দে একটা বিকট চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল তাতু, কাকামণিই মুখে হাত দিয়ে ওকে মানা করলেন। তার মানে চিনিবাসকে কাকামণিও দেখতে পেয়েছেন। তাহলে কাকামণি যাচ্ছেন না কেন ওদিকে !

"একদম চুপ করে থাক।" কাকামণির গলা ফিস-ফিস করছে, তাতু শুনতে পেল—"আমরা যে নকুলদানাওয়ালা নই বুঝতে পারলেই ও পালাবে।"

"কিন্তু কাছে না গেলে ওকে ধরবে কী করে ?"

"দেখ না কি করি !"

কাকামণি ওর হাত ধরে আস্তে আস্তে রাস্তাটা পার হলেন, তারপর চিনিবাসের প্রায় হাত-দশেক দূরে এসে থমকে

দাঁড়ালেন।

চিনিবাস ওখান থেকে নড়ছে না। পালিয়েও যাচ্ছে না, আবার এগিয়েও আসছে না। কাকামণির সঙ্গে তাতু আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল।

এবার নিশ্চয়ই চিনিবাস ওদের ভাল করেই দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, এবারও তো সে পালাবার কোনও চেষ্টা করছে না।

কাকামণি এবার ওখানেই উবু হয়ে বসে টুপি আর থলি নামিয়ে রাখলেন মাটিতে। চিনিবাস একবার মাথা নিচু করে চাইল ওগুলোর দিকে। তাতুরা একটু সরে এল রাস্তার দিকে।

এক মিনিট। দু'মিনিট। ওরাও নড়ছে না চিনিবাসও নড়ছে না!

শেষ পর্যন্ত চিনিবাসই নেমে এল রেলিং থেকে। গুটিগুটি এগিয়ে গেল টুপির দিকে। তাতুদের যেন দেখতেই পাচ্ছে না, এইভাবে টুপিটার সামনে এসে বসে পড়ল। হাত দিয়ে টুপিটা তুলে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কী যেন দেখতে লাগল।

"এবার ওকে ধরি কাকামণি?" তাতু ফিসফিস করে বলল।

"দাঁড়া না, আঁচড়ে-টাচড়ে দেয় যদি!" কাকামণির যেন একটু ভয়-পাওয়া গলা।

"না না কাকামণি, চিনিবাস খুব লক্ষ্মী—আমাদের হাতে কতবার ও থলি থেকে প্যাকেট তুলে দিয়েছে!"

"তাহলে চল, ওর কাছে গিয়ে দেখি কী করে।"

কাছে যেতে যেটা হল সেটা আরও অদ্ভুত। যেন ওদের কতদিনের পোষা, এই ভাবে চিনিবাস তাতুর মুখের দিকে তাকাল। তাতু হাত বাড়াতেই সুড়সুড় করে উঠে এল ওর কাঁধে।

তারপর? সেও কি আবার বলতে হয় নাকি! টুপি আর থলি কুড়িয়ে নিয়েই কাকামণি ট্যাক্সি ধরলেন। সারাটা রাস্তা লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপটি করে বসে রইল চিনিবাস। আর, সত্যিই যে ও অত শান্তশিষ্ট নয়—সেটা বোঝা গেল নার্সিং হোমে লোকটার কাছে যাবার পর।

ওঃ, সে কী কাণ্ড! কিচির-মিচির শব্দ করে চুলটুল সব এলোমেলো করে লোকটাকে একেবারে নাজেহাল করে দিল ও। যত চেঁচায় চিনিবাস, তত চেঁচায় লোকটা—ব্যাপার দেখে নার্সিং হোমের সিস্টাররা সব ছুটে এলো। একজনের তো চিনিবাসকে দেখেই আঁতকে উঠে প্রায় ভিরমি খাওয়ার যোগাড়। কাকামণি অবশ্য বুঝিয়ে দিলেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই—নেহাতই পোষা হনুমান, কোনও রকম উৎপাত করবে না। তবে কাকামণির কথা শুনেও ওঁরা খুব খুশি হলেন না সে ওঁদের মুখ দেখেই বুঝতে পারল তাতু।

কিন্তু মনের খুশি তাতু নিজে আর চেপে রাখতে পারল না, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আয় তো আমার চিনিবাস।"

চিনিবাস একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল। তারপর তড়াক করে নেমে এল খাট থেকে। মেঝেয় রাখা থলিটা থেকে খপ্ করে একটা প্যাকেট বার কয়েক কিচ কিচ শব্দে এক দাঁত-খিচুনি হাসি উপহার দিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল তাতুর দিকে।

ছবি : প্রবীর সেন

জেনে নাও

ভয়ে কেন মুখ ফ্যাকাসে

ভয় পাই বা বিপদে পড়ি, যাই হোক না কেন, শরীরের প্রথম কাজই হল নিজেকে বাঁচানো। যেই ভয় পাই অমনি আত্মরক্ষার জন্যে দেহের ভেতরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বেশি সক্রিয় হওয়ার জন্যে অতিরিক্ত রক্তের দরকার। এই অতিরিক্ত রক্ত ছুটে আসে শরীরের প্রান্তভাগ থেকে। মুখ থেকেও রক্ত চলে আসে। তাই ফ্যাকাসে দেখায় মুখ। গা, হাত, পা-ও ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

এ-ছাড়া আরও একটা কথা বলা দরকার। আমাদের শরীরে অ্যাড্রেনালিন নামে এক ধরনের হরমোন আছে। এই হরমোনটা অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির মজ্জা অংশ থেকে বেরিয়ে আসে। ভয় পাওয়ার সময় অ্যাড্রেনালিন হরমোনের প্রভাবে শরীরের প্রান্তভাগের ব্লাড ভেসেল সরু হয়ে আসে। সরু হলে নিশ্চয়ই ওই সব অঞ্চলে রক্ত সরবরাহ কমে যাবে। মুখ সমেত শরীরের প্রান্তভাগগুলো সাদা দেখানোর এটাও একটা কারণ।

টিউবলাইটে ছায়া পড়ে না কেন

একটা মোমবাতির সামনে দাঁড়াই। পিছনে ছায়া পড়ে। আমার ভেতর দিয়ে আলো যাচ্ছে না, আমি অস্বচ্ছ। সেইজন্যেই ছায়া। শুধু মোমবাতির সামনে কেন, গোল বালবের আলোতেও ছায়া। কিন্তু টিউবলাইটের বেলায় সে ছায়া বোঝা যায় না কেন?

টিউবলাইট গোল নয়। সে লম্বা আর দৈর্ঘ্যে তা দু' ফুট বা তিন ফুট। এই টিউবলাইট যখন জ্বলে, তখন তাকে কি একটা আলোর উৎস হিসেবে কল্পনা করা যায়? না, টিউব লাইট একটা রেখা বরাবর যেন অসংখ্য ক্ষুদ্র আলোর উৎসের সমষ্টি।

এর যে-কোনো একটা উৎসের কথা ধরা যাক। সেখান থেকে আলো এসে কোনো বস্তুতে বাধা পেয়ে ছায়ার সৃষ্টি করে। সেই ছায়া আমাদের চোখে খুব ভালভাবে ধরা পড়ত, যদি সেখানে আর কোনো উৎস আলো না দিত। টিউবলাইটের দীর্ঘ টিউব তো অসংখ্য আলোর উৎসের সমষ্টি। সেখানে একটা উৎসের জন্যে ছায়া অন্য উৎসের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। ফলে ছায়া ফুটে ওঠার তেমন কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

“দিদা, দিদা, বাবা আজকে এতো দুষ্টুমি করছে কেন?”

“কেন রে ছোটন কি করেছে?”

“দেখ না! লক্ষী ছেলের মত খাচ্ছে না।”

“পেট খারাপ হয়েছে যে। পেট খারাপ হলে হজম হয় না, তাই কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।”

“কিন্তু না খেলে যে গায়ে জোর পাবে না—আর কালকে বেরোবে কি করে?”

“তুমি কিছু ভেবো না। আমি এমন জিনিস্ দেবো যা চট করে হজম হয়ে যাবে। জান সেটা কি? ওই যে তুমি রোজ যেটা খাও!”

“জানি! রবিনসন্স্ বার্লি।”

“ঠিক বলেছ। এই বার্লি খুব হাল্কা খাবার বলে চট করে হজম হয়। তাছাড়া খাঁটি বার্লির সব গুণই রবিনসন্স্ বার্লিতে আছে। তাই পেট খারাপ হলে ডাক্তারবাবুরাও রবিনসন্স্ বার্লি খেতে বলেন।”

“আচ্ছা দিদা...”

“আর কথা নয়। নাও এই এক গেলাস বার্লি বাবাকে দিয়ে এস দেখি?”

“বাবা, বাবা, এই নাও তোমার রবিনসন্স্ বার্লি।”

রবিনসন্স্ বার্লি

হালকা আহার আর সহজ হজমের পথ্য

LINTAS(C)/ROB/4/2416 BG

দেখতে একরকম

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আত্মীয়কুটুম প্রাণীদের চেহারায়ও মিল থাকে। লতায় পাতায় তারা একে অন্যের কত কাছাকাছি, তাদের ভেতরকার সাদৃশ্য দেখে তা ধরা যায়। রঞ্জু আর অঞ্জুকে দেখেছ? দেখলেই বোঝা যায়, ওরা দুই ভাই। কিন্তু মিল যে সব সময় ওপরটা দেখলেই ধরা যায়, তা নয়। কয়েকটি প্রাণীর কঙ্কালের ছবি দ্যাখো :

বাঁ দিকে ব্যাঙ। ডানদিকে মানুষ। অনেকটা একরকমের দেখতে নয় কি? মাথার খুলি, হাত, পা, আর বিশেষ করে

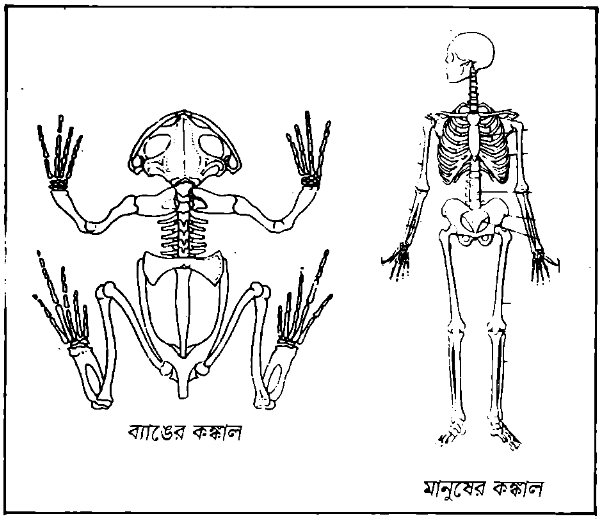

শিরদাঁড়া। বড় করে ধরলে বলা যায়, এরা এক পরিবারের। -দের পরিবারের নাম হল মেরুদণ্ডী। এরা শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণী।

মানুষের দিক থেকে ব্যাঙের চেয়েও নিকটাত্মীয় হল শিম্পাঞ্জি। মাথার খুলি, হাত, পা, শিরদাঁড়া তো বটেই, এদের সেইসঙ্গে আছে চুল, স্তনাগ্র আর নাভি। মুখ আর নাকের গড়ন অনেকটা এক। আঙুল দিয়ে ধরে জিনিস তুলতে পারে। দু' পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে বা কুঁজো হয়ে হাঁটতে পারে।

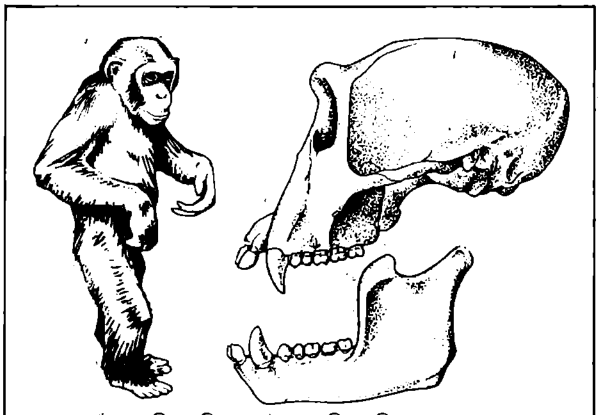

(বাঁয়ে) শিম্পাঞ্জি, (ডাইনে) শিম্পাঞ্জির মাথার হাড়

ভেবে দ্যাখো, মানুষের একটা হাত, কুকুরের একটা সামনের পা, বাদুড়ের একটা ডানা আর তিমিমাছের একটা পাখনা। বাইরে থেকে খুব একটা মিল চোখে পড়ে না। অথচ এই দ্যাখো এদেরই হাড়ের ছবি :

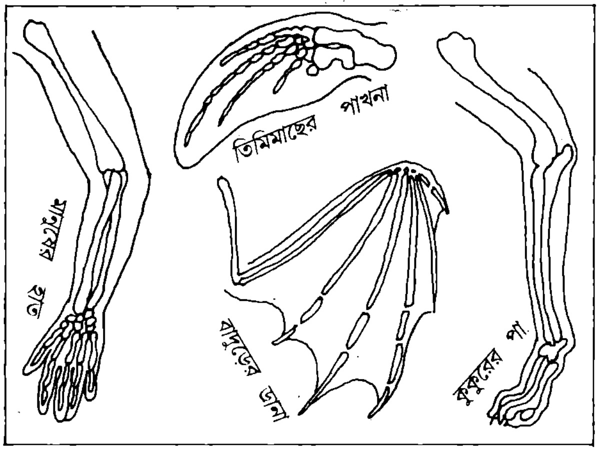

কী আশ্চর্য মিল। লক্ষ করলে দেখবে, এদের হাড়ের সংখ্যা এক এবং গড়নও প্রায় এক।

এক পরিবারের বলেই এদের এত মিল। এ থেকে প্রমাণ হয়—এই সব প্রাণী পরস্পরের আত্মীয়; এদের পূর্বপুরুষ এক। (ক্রমশ)

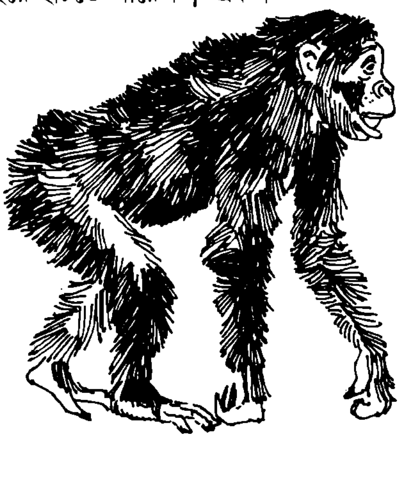

টিনটিন

আরে এসো এসো, ক্যাপ্টেন এসো, তোমারই পথ চেয়ে বসে আছি ।
চালাকি পেয়েছ ? আমার বাড়িতে কী করছ তোমরা ?
আরে, তোমার বাড়ি তো আমারও বাড়ি । তুমি নেই শুনে…
নিজেকে বললুম, 'জয়লন, যাও, বন্ধুর বাড়িতে কটা দিন ছুটি কাটিয়ে এসো ।'
সব্বাই এসেছি ।
দেখে যাও সব্বাই !
ক্যালকুলাস ! কী হল, কে জানে !
নকশার মাইক্রোফিল্ম এখানেই রেখে গিয়েছিলুম ! সত্যি, কী যে ভুলো মন আমার !
বাঃ, বাঃ ! বর্ডুরিয়ানরা ওই নকশা তাহলে পাচ্ছে না !
খাচ্ছে না ? কে ?
যাই বলো, বর্ডুরিয়ানরা বিলকুল জব্দ হয়ে গেল !
নকশা ছাড়া কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না । এবারে এই ফিল্মটাকে আমি পুড়িয়ে ফেলব !
তোমার পাইপের আগুনেই পোড়াব !
হুউশ
ওরে বাবা ! জ্বলে গেলুম !
ঠিক বুঝতে পারিনি !
বুঝতে পারেননি ? বাজে কথা ! স্লাই ফক্স !
চিকেন পক্স ?

আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে

টিনটিনের নতুন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

লোহিত সাগরের হাঙর

দারুণ মজার সব কাণ্ডকারখানা ! রহস্য আর হাসির বারুদে ঠাসা তুবড়ির মতো ফুলকি-ছড়ানো গল্প ! একেবারে প্রথম থেকেই পড়তে থাকো ! নইলে কিন্তু খেই ধরতে পারবে না !

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। একটা চাবি দিয়ে সে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" লোকটা নাকি শিবুবাবুর শাকরেদ ছিল ; শিবুবাবুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে সে নানা উদ্ভট খবর জানায়। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে, আর-এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। উটকো লোকটা দুজনকেই ভূতের ভয় দেখায়। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটি দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে বিনোদ হাই-কে জেতবার পর হাতরাশগড়ের মহারাজ তাদের কোচ রেখে খেলা শেখাতে ইচ্ছুক। মহারাজের গাড়িতে তাঁর প্রাসাদে যাবার পথে দুই ভাই সন্দিগ্ধ হয়ে তাঁকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। গাড়ি থামতে তারা জঙ্গলে পালায়। তারপর...

কেউ তাড়া করছে না দেখে ঘড়ি আর আংটি দৌড়ের গতি কমিয়ে দিল। কুয়াশা এবং গাছগাছালির জন্য জোরে দৌড়নো সম্ভবও নয়। অন্ধকারও হয়ে এসেছে। দুলকি চালে দৌড়োতে দৌড়োতে ঘড়ি বলল, "খুব বেঁচে গেছি। লোকটার গায়ে ভীষণ জোর।"

আংটি বলল, "শুধু জোরই নয়, যে-দুটো সাঙ্ঘাতিক ক্যারাটের মার হজম করল, তাতেই বোঝা যায় মারপিটের লাইনের লোক। রাজা-ফাজা কিছু নয়।"

বড় বড় গাছ সংখ্যায় কমে আসছে। জঙ্গলটা ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। ঘড়ি সামনের দিকে চেয়ে বলল, "আমরা বড় রাস্তার কাছাকাছি এসে গেছি মনে হচ্ছে।"

বাস্তবিকই তাই। সামনে একটা বড়-বড় ঘাসের জঙ্গল। তারপরই বড় রাস্তা। সামনে একটা লরি মেরামত হচ্ছে। এক-আধটা সাইকেলও যাচ্ছে আসছে।

লোকজন দেখে দুই ভাই নিশ্চিন্ত হয়ে রাস্তায় উঠে এল। দু'পাশে তাকিয়ে দেখল, মহারাজার গাড়ির কোনও চিহ্নও নেই। এ জায়গাটা ঘড়ি বা আংটির চেনা জায়গা নয়। এদিকটায় তারা কখনও আসেনি।

হাট সেরে কয়েকজন গেঁয়ো লোক ফিরছিল। ঘড়ি তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করল, "এ জায়গাটার নাম কী ?"

"হরিহরপুর।

"আমরা শহরের দিকে যাব। কী ভাবে যাওয়া যায় ?"

লোকটা একটু অবাক হয়ে বলল, "তার ভাবনা কী ? একটু বাদেই বাসগাড়ি এসে যাবে। চেপে বসলেই শহরে নিয়ে গিয়ে তুলবে। ওই বোধহয় আসছে, এ পাশটায় দাঁড়িয়ে হাত তুলুন।"

ঘড়ি আর আংটি দেখল, সত্যিই একটা বাস আসছে। খুবই লজঝড়ে চেহারা। ভিড়ে ভিড়াক্কার। ভিড় দেখে তারা আজ খুশিই হল।

বাসে উঠে দুই ভাই ভিড়ের ভিতর সেঁদিয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত লাগছে।

দু'তিনটে স্টপ পার হওয়ার পর কিছু লোক হুড়মুড় করে নেমে যেতে বাসটা হঠাৎ বেশ ফাঁকা হয়ে গেল।

হঠাৎ আংটি চাপা স্বরে বলল, "দাদা, পিছনে দ্যাখ।"

ঘড়ি তাকিয়ে দেখে থ হয়ে গেল। পিছনের সিটে জানালার ধারে একটা সুড়ুঙ্গে লম্বা লোক বসে-বসে ঢুলছে। বাসের আবছা আলোতেও লোকটার চেহারা ভুল হওয়ার নয়। রাজা নরনারায়ণের সেক্রেটারি।

লোকটা কী করে বাসের মধ্যে এল বুঝতে পারল না ঘড়ি। তবে সে চাপা স্বরে বলল, "মুখ ঘুরিয়ে রাখ। দেখতে পাবে।"

লোকটা অবশ্য দেখল না। বসে-বসে যেমন ঢুলছে তেমনই ঢুলতে লাগল। আড়চোখে চেয়ে ঘড়ি মাঝে-মাঝে দেখছিল, লোকটার ঘাড় লটপট করছে। মাথাটা বাসের ঝাঁকুনিতে মাঝে-মাঝে জোরসে ঠুকে যাচ্ছে জানালায়। তবু কী ঘুম বাবা ! একটুও চোখ মেলল না।

বাস থামছে। লোকজন নামা-ওঠা করছে। সেক্রেটারি নির্বিকার ঘুমোচ্ছে বসে বসে।

আংটি চাপা স্বরে বলল, "দাদা, লোকটা বোধহয় আমাদের দেখতে পেয়েছে। ঘুমের ভান করে নজর রাখছে।"

ঘড়ি তীক্ষ্ণ চোখে আর একবার দেখে নিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "তাও হতে পারে, তবে সাবধানের মার নেই। মুখটা আড়াল করে থাক।"

একটু বাদে কয়েকজন লোক নেমে যাওয়ার পর দুই ভাই বসবার জায়গা পেয়ে গেল। বসে দুজনেই মাথা নামিয়ে রেখে আড়ে-আড়ে নজর রাখতে লাগল।

আশ্চর্যের বিষয়, সুড়ুঙ্গে সেক্রেটারি একবারও চোখ মেলল না বা তাদের দিকে তাকাল না। সেক্রেটারির পাশে বসা লোকটা মাঝে-মাঝে বিরক্ত হয়ে ধমক দিচ্ছিল, "ও মশাই, গায়ের ওপর ওরকম হেলে পড়ছেন কেন ? সোজা হয়ে বসুন না।"

কিন্তু সেক্রেটারির তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

পাশে বসা লোকটা গেঁয়ো প্রকৃতির। বেশ জোরে-জোরেই গজগজ করে বলতে লাগল, "সেই হরিহরপুর থেকেই এমন কাণ্ড শুরু করেছে যে, অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। এমন গায়ে-পড়া লোক জন্মে দেখিনি বাবা। কতবার সোজা হয়ে বসতে বলছি, তা ইনি কথাটা কানেই তুলছেন না। চাষার ঘুমকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন।"

ঘড়ি আর আংটি সবই শুনল। পরস্পরের দিকে একটু তাকিয়ে নিল দু'জনে।

সামনের একটা গঞ্জে বাসটা দাঁড়াতেই পেছনের সিট থেকে সেক্রেটারির পাশে বসা লোকটা একটা পুঁটুলি নিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং নেমে পড়ল। সেক্রেটারি জানালায় হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

অনেকে নেমে যাওয়ায় সেক্রেটারির পাশে আর কেউ বসল না। বাস প্রায় ফাঁকা। আর দু' মাইল দূরে শহর।

বাসটা আবার ছাড়তেই হঠাৎ পিছনের সিটে একটা বিকট

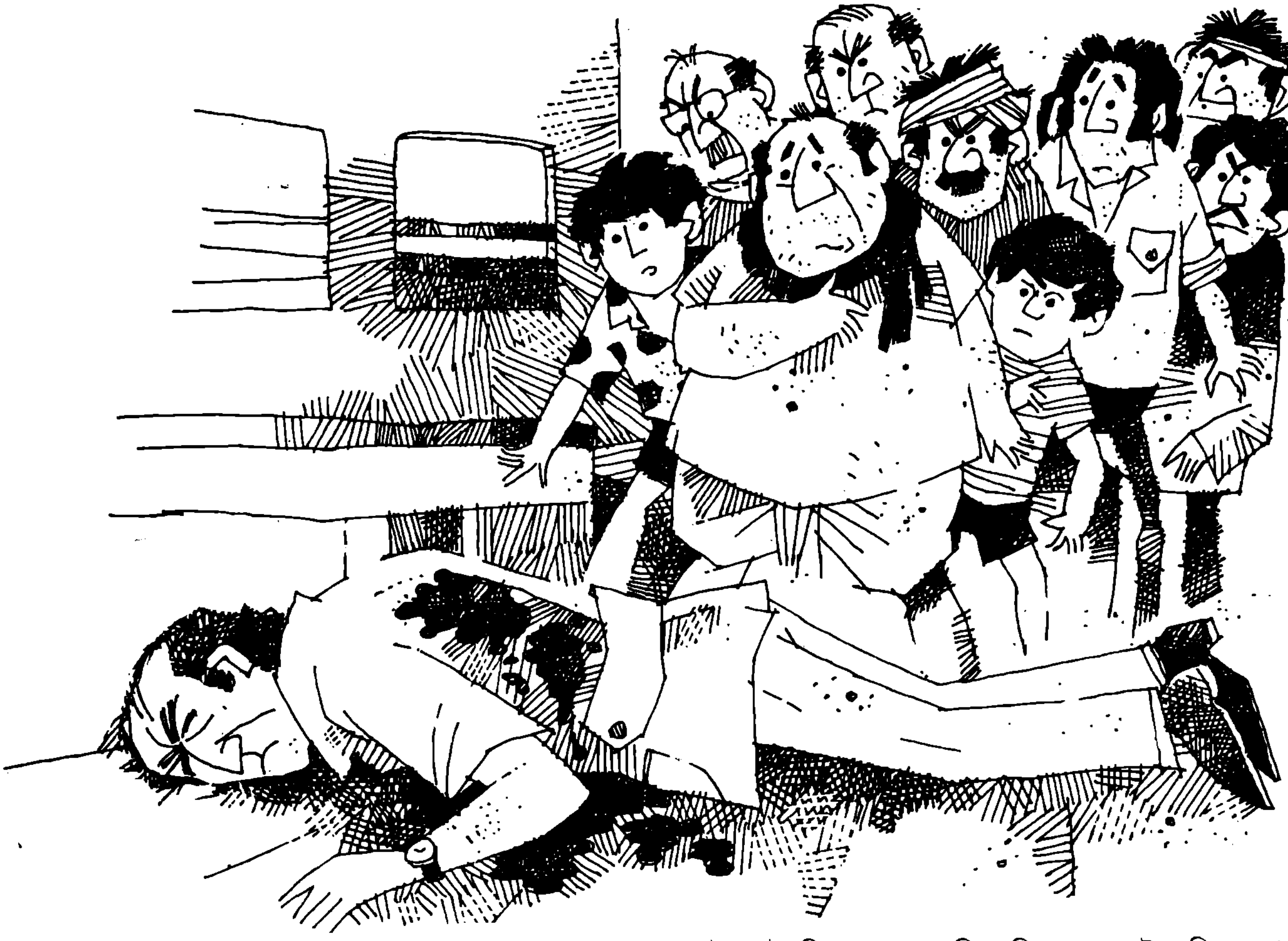

শব্দ শোনা গেল। সকলে চমকে চেয়ে দেখে, সুড়ুঙ্গে সেক্রেটারি মেঝের ওপর পড়ে আছে সটান হয়ে।

হৈহৈ করে ওঠে লোকজন, "পড়ে গেছে···অজ্ঞান হয়ে গেছে···জল···পাখা···"

ঘড়ি আর আংটি খানিকটা থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি অন্য সব লোকজনের সঙ্গে মিলেমিশে এগিয়ে গিয়ে দেখল।

যা দেখল, তাতে তাদের চোখ চড়কগাছ। এরকম ঘটনা তারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি।

লোকজন প্রচণ্ড চেঁচাতে লাগল, "রক্ত···রক্ত···উরেব্বাস রে··· খুন···খুন···"

খুন যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেক্রেটারি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত পিঠটা রক্তে ভাসাভাসি মাখামাখি।

বাস থেমে গেল। লোকজন সব নেমে পড়তে লাগল দুড়দাড় করে। বাইরে চেঁচামেচি শুনে আবার লোকজন জুটেও গেল অনেক।

এই চেঁচামেচি আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঘড়ি মাথা ঠাণ্ডা রেখে চটপট যা দেখার দেখে নিল। সেক্রেটারির পরনে সেই নীলচে ধূসর রঙের স্যুটটাই রয়েছে। লোকটার মাথার চুল পাতলা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পায়ে বেশ ঝাঁ-চকচকে একজোড়া জুতো।

রক্তে-মাখা পিঠটার ঠিক মাঝামাঝি মেরুদণ্ডের ওপর একটা ছ্যাঁদা লক্ষ করল ঘড়ি। বন্দুক বা পিস্তলের গুলিই হবে, ঘড়ি আরও লক্ষ করে, যেখানে সেক্রেটারি বসে ছিল ঠিক সেইখানে বাসের পেছন দিককার সিটেও একটা ফুটো। সন্দেহ নেই কেউ পিছন থেকে গুলি চালিয়েছে। সেই গুলি বাস ফুটো করে সেক্রেটারির শরীরে ঢুকে গেছে। সম্ভবত মৃত্যুও হয়েছে তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কোণের দিকে ভিড়ের চাপে সেঁটে বসে ছিল বলে এতক্ষণ পড়ে যায়নি।

ঘড়ি চাপা গলায় বলল, "আংটি, চল্, কেটে পড়ি। এখানে আর থাকা বিপজ্জনক।"

আংটি মাথা নেড়ে বলে, "সেই ভাল।"

দুই ভাই নেমে পড়ল।

এ জায়গাটা তাদের চেনা। বহুবার এসেছে। লালমণিপুর। এখানে মণ্টু নামে ঘড়ির এক বন্ধু থাকে। বেশ বড়লোক।

ঘড়ি বলল, "চল, মণ্টুর মোটর সাইকেলটা নিয়ে ফিরে যাই।"

মণ্টুর বাড়ি বেশি দূর নয়। রাস্তার ওপরেই তাদের বিশাল বাগানঘেরা বাড়ি।

মণ্টু বাড়িতেই ছিল। তারা যেতেই বেরিয়ে এসে বলল, "আরে! তোদের কী খবর বল তো! আজ এত বড় একটা ম্যাচ জেতার পর কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলি? সবাই তোদের খোঁজ করে অস্থির। কোন্ রাজা নাকি তোদের নিয়ে গেছে।"

ঘড়ি বেশি ভাঙল না। বলল, "পরে সব বলব। এখন তোর মোটর সাইকেলটা দে। বাড়ি ফিরতে হবে।"

(ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

রোভার্সের রয়
মেলচেস্টার রোভার্স
স্টেভ নেলরের ভুলের জন্যে স্ট্যামব্রিজ সিটি পেনাল্টি পেয়েছে
ক্রিটে বেড়াতে এসেছে রোভার্স দল। দুটি ফ্রেণ্ডলি ম্যাচও এখানে তারা খেলবে। প্রথম খেলা স্ট্যামব্রিজ সিটির বিরুদ্ধে। তাতে নতুন খেলোয়াড় স্টেভের ভুলের জন্যে স্ট্যামব্রিজ পেনাল্টি পেল···
স্টেভ নার্ভাস বলেই এটা হল!
স্ট্যামব্রিজ পেনাল্টি পেল !
ভেবো না, স্টেভ !
চার্লি ঠিক দিকেই ঝাঁপিয়েছিল, কিন্তু···
চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারল না !
গো-ও--ল!
রয়, আমি···
প্রথম-প্রথম ভুল হয়ই ! তোমারও হয়েছে, স্টেভ···
এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখেখেলে যাও!
বিপক্ষ আনন্দে আত্মহারা···
এক গোলে খুশি নই ! আরও গোল দেব !
রয় বুঝুক, আমরাও কম নই !
আবার হানা দিয়েছে স্ট্যামব্রিজ···
বাপ রে ! একটুর জন্যে গোল হয়নি !
গ্যালারিতে বসে আছে রোভার্সের গোপন শত্রু···
হুঁহুঁ, রোভার্সকে নার্ভাস করে দিয়েছি!
জারকাড়ি ফাইনালে উঠবেই !
হঠাৎ বল পেল স্টেভ নেলর···
বাঁয়ে বল পাঠাও !
রয়কে দাও !

কিন্তু…
বড্ড জোরে বল ঠেলেছে !
রয়পাবে না !
বাপ্ রে কী স্পিড!
বলটা ধরবই !
রয় বল ধরেছে !
যাঃ !
যাক, রয় বল ধরে এগোচ্ছে !
রয় বল ঠেলল প্যাকোকে…
গোল শোধ !
দুর্দান্ত পাস!
শাবাশ !
কৃতিত্ব তোমার, স্টেভ !
শাবাশ, স্টেভ !
ধন্যবাদ!
চালিয়ে যাও, স্টেভ !
খানিক বাদে…
স্টেভকে প্রশংসা করায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে !
জিমি, নাও !
জিমি মাঝমাঠে বল পাঠাল…
ঠিকমতো পাস হয়নি !
ধরো স্ট্যামব্রিজ
নেলর জব্বর হেড করেছে !
বল গোলে ঢুকল !
রোভার্সের গোপন শত্রু চিন্তিত…
আরে, রোভার্সের সঙ্গেই জারকাডিকে খেলতে হবে নাকি ?
দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি !
কী মজা দেখাবার ফন্দি আঁটছে রোভার্সের গোপন শত্রু ?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

“ও কেন বলটা নিয়ে খেলবে ?”

অসমিয়া গল্প

উপহার

ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া

বাড়িতে লোকজন এলে ভারী মজা। আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায় মনু-তনু। পড়াশুনো করতে হয় না। মা-বাবার বকুনিও শুনতে হয় না তেমন। তাছাড়া যাঁরা বাড়িতে আসেন, তাঁদের অনেকেই ভাল গল্প-বলিয়ে। সুন্দর-সুন্দর গল্প বলেন তাঁরা। এরকম গল্প মা-বাবাও বলতে পারেন না।

কলে জল আসে কোত্থেকে, মনু একবার জিজ্ঞেস করেছিল বাবাকে। বাবা বলেছিলেন, “মাটির নীচ থেকে।” ব্যস্‌, ওই পর্যন্ত। তারপর মনুর আর-কোনও প্রশ্নের জবাব বাবা দেননি। “পরে বলব”, বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

বাবা না বললে কী হবে, মনুর ছোটমামা সব জানিয়ে দিলেন একদিন। তিনি তো খুব আমুদে আর গল্পবাজ মানুষ, মনুর জানবার শেখবার ইচ্ছে দেখে মনে মনে খুব খুশি হলেন। কলে কেন জল পড়ে, সেই জল আসে কোত্থেকে, সব গল্পের মতো করে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন মনুকে।

মেঘের আড়ালে সত্যিই ভগবান থাকেন কি না, মা'র কাছে জানতে চেয়েছিল তনু। কোনও জবাব পায়নি। মা বলেছিলেন, “কাজের সময় বিরক্ত কোরো না। যাও, বাবার কাছে গিয়ে জেনে নাও।” কিন্তু তনু ছাড়বার পাত্র নয়। বাড়িতে যেদিন বড়কাকা এলেন, সেদিন সে তার সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল।

আজ স্কুল থেকে ফিরেই ওরা দেখতে পেল, বাড়ির বারান্দায় এক ভদ্রলোক চুপ করে বসে আছেন। ওদের দেখেই তিনি বলে উঠলেন, “এই যে, এসে পড়েছ তোমরা ?”

ওরা তো ভদ্রলোককে চেনে না, ঠিক কী বলবে বুঝতে না পেরে ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরে মা একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছেন। একটি বাচ্চা ছেলে বসে আছে। বাচ্চাটি মনুর পেনসিল-বাক্স, তনুর ভাঙা কাঠের ঘোড়া আর কিছু টুকিটাকি জিনিস নিয়ে নিজের মনে খেলা করছে। মায়ের কথায় মনু-তনু বুঝতে পারল, ভদ্রমহিলা ওদের এক পিসিমা। বাচ্চাটি পিসিমার ছেলে রূপটি, আর বাইরে যিনি বসে আছেন, তিনি ওদের পিসেমশাই। পিসিমা রূপটিকে বললেন, “এই যে রূপটি, এরা তোমার দাদা, বুঝেছ ? মনুদাদা, তনুদাদা।”

রূপটির চোখে খুশির ঝিলিক। আধো-আধো গলায় বলল, “মনুদাদা, তনুদাদা।”

রূপটির মুখে ‘মনুদাদা’ ‘তনুদাদা’ শুনে ওরা তো খুব খুশি। ওদের তো এর আগে কেউ দাদা বলে ডাকেনি। তার ওপর এই খুদে ভাইটির গলাও ভারী মিষ্টি। মনু-তনু রূপটিকে নিয়ে হৈহৈ ফেলে দিল। ওদের আদর আর আহ্লাদের ঘটা দেখে মা হাঁহাঁ করে উঠলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। মনু খাটের নীচে বসে ‘কু’ ‘কু’ আওয়াজ করে, আর রূপটি খাটের ওপর থেকে ঝুঁকে ওকে খুঁজতে থাকে। তনু হাঁটু মুড়ে হাতি হয়, রূপটি তার পিঠের উপর চড়ে ‘হ্যাট’ ‘হ্যাট’ করে। মনু জিজ্ঞেস করে, “রূপটি, বলো তো কে ভাল, আমি না তনু ?” কী জবাব দেবে ভেবে পায় না রূপটি। তনু বলে, “রূপটি, তুমি ঠিক ধরেছ। এবার বলো, তনুদাদা ভাল, তনুদাদা ভাল।” মনু বলে, “না, না, রূপটি, তনুদাদা কক্ষনো ভাল নয়। বলো, মনুদাদা ভাল।”

দুই ভাইয়ে যখন ঝগড়া বাধবার উপক্রম, হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে রূপটি, “মনুদাদা ভাল, তনুদাদা ভাল।” মনু-তনু চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়, “কে বেশি ভাল রূপটি ? ঠিক করে বলো।”

রাতে খাবার টেবিলে বসে মনু-তনু আবার ঝগড়া বাধিয়ে

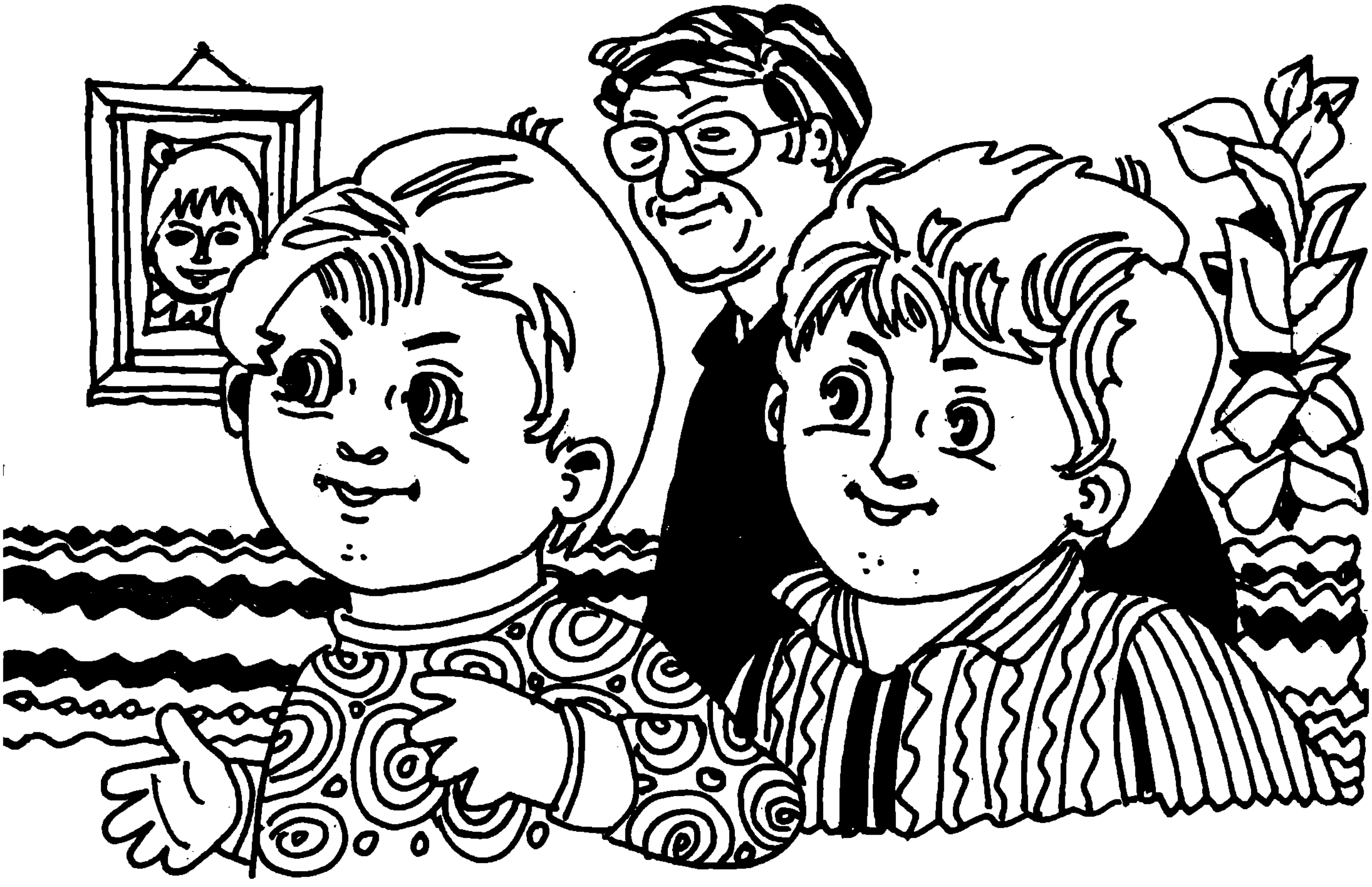

দেয়। রূপটি কার পাশে বসে খাবে, এই নিয়ে ঝগড়া। ঝগড়া বেশ বাড়ছে দেখে পিসিই এগিয়ে এলেন। বললেন, "শোনো মনু-তনু, রূপটি তো ছোট। ও কাঁটা বেছে মাছ খেতে পারে না। তোমরা খেয়ে নাও, ও আমার সঙ্গে খাবে।" খাওয়াদাওয়ার পর আবার সমস্যা। রূপটি কোথায় শোবে, এই নিয়ে দু'ভাইয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। এবারও পিসি এসে ঝগড়া থামালেন, "রূপটি রাত্রে খুব বিরক্ত করে, তোমাদের ঘুমুতেই দেবে না। ও আমার কাছে শোবে, সকালে আবার খেলাধুলো কোরো। কেমন?"

মুখ ভার করে ঘুমোতে যায় মনু-তনু।

রূপটির বাবা বড় গরিবমানুষ। সামান্য আয়ে কোনওরকমে সংসার চলে। অনেক কষ্টে গাড়িভাড়া যোগাড় করে এখানে এসেছেন। খুব ইচ্ছে ছিল মনু-তনুর জন্য দু'একটা খেলনা-টেলনা কিনে আনবেন। কিন্তু পয়সার অভাবে পেরে ওঠেননি।

সকালে মনু-তনু ঘুম থেকে উঠতেই রূপটির মা ওদের ডেকে একটি পাঁচ টাকার নোট দিলেন। সামনেই ছিলেন মনু-তনুর মা-বাবা। ওঁরা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, "এ কী করছ! ওদের টাকা দিচ্ছ কেন? টাকা দিয়ে ওরা কী করবে?"

রূপটির মা বললেন, "ওদের বারণ কোরো না। আমরা তো ওদের জন্য কিছু আনতে পারিনি। যা হোক একটা খেলনা-টেলনা ..."

মনু-তনুর বাবা বললেন, "ওদের কোন্ খেলনাটা নেই বলতে পারো? কী করবে ওরা এত খেলনা নিয়ে?"

রূপটির মা'র পীড়াপীড়িতে মনু-তনুর বাবা-মা শেষপর্যন্ত আর কোনও আপত্তি করলেন না। মনু-তনু এতক্ষণ মুখ-গোমড়া করে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন হাতে টাকা পেয়ে ভারী খুশি। যেন আকাশের চাঁদ পেয়ে গেল মুঠোয়। ছেলেবেলার দু'চারটে ভাঙা তোবড়ানো খেলনা পড়ে আছে। সেই ধুলোময়লামাখা খেলনা দিয়ে কেউ খেলে? এই টাকাটায় এবার একটা নতুন খেলনা কেনা যাবে। একসঙ্গে হাতে এতগুলো টাকা পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

স্কুলে যাওয়ার সময় মনু-তনু বেশ ভাবনায় পড়ে গেল। কী কিনবে পাঁচ টাকা দিয়ে! এই টাকায় তো আর এক নম্বর বল পাওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, দাস অ্যাণ্ড কোম্পানিতে পাঁচ টাকায় প্লাস্টিকের বল পাওয়া যেতে পারে। সেটা আবার দেখতে এক নম্বরের চেয়েও বড়। কিন্তু বড্ড পাতলা, প্লাস্টিকের বল তো! তা হোক, বাড়ির সামনে বেশ খেলা যাবে।

সেদিন মনু-তনুর আর ক্লাসের পড়ায় মন বসল না। স্কুল ছুটির পরেই ওরা দাস অ্যাণ্ড কোম্পানিতে গিয়ে একটি প্লাস্টিকের বল কিনে ফেলল। পাঁচ রঙের ভারী সুন্দর বাহারি বল। রাস্তায় একটু খেলেও নিল।

বাড়ী পৌঁছেই ভারী মুশকিলে পড়ে গেল দু'ভাই। রূপটি বল দেখে 'আমায় দাও' 'আমায় দাও' বলে চ্যাঁচাতে লাগল। কিছুতেই দেবে না মনু-তনু, রূপটিও ছাড়বে না। কিন্তু মা'র কথায় শেষ পর্যন্ত এই ছোট্ট ভাইটিকে বলটা দিয়ে দিতেই হল। বল হাতে পেয়ে রূপটির মনে ফূর্তি আর ধরে না! সে সারা ঘরে দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিল।

বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে হল। রূপটি কিন্তু একবারের জন্যেও

বলটা হাতছাড়া করল না। মনু-তনু অনেক চেষ্টা করেও রূপটির হাত থেকে বলটা কেড়ে নিতে পারল না। নিরুপায় হয়ে মনু বলল, "এসো রূপটি, আমরা তিনজনে মিলে বলটা খেলি। আমি তনুকে দেব। তনু তোমাকে দেবে। তুমি আবার আমায় দেবে। কেমন ?" কিন্তু কে শোনে কার কথা! পিসি ধমক দেন বটে, কিন্তু কোনও কাজ হয় না।

মনু রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে একসময় জিজ্ঞেস করল মা'কে, "বলটা কি আমরা খেলতে পাব না ?"

মা জবাব দেন, "নিশ্চয়ই খেলবে। রূপটি যখন রেখে দেবে, তখন খেলো।"

তনু মায়ের কথায় মোটেই খুশি হয় না। বলে, "ও কেন বলটা নিয়ে খেলবে ? বলটা তো আমাদের।"

মা হেসে বললেন, "বলটা তোমাদের হবে কেন ? বল কেনবার পয়সা তোমরা কোত্থেকে পেয়েছিলে, মনে নেই ?"

এরপর মনু-তনু আর কী বলবে। ওরা বুঝতে পারে, মা ঠিকই বলেছেন। বলটা সত্যি-সত্যিই ওদের। টাকা দিয়েছিলেন পিসিমা। সেইজন্যই বলটা রূপটিরই পাওয়া উচিত।

সন্ধেবেলায় রূপটি ঘুমোবার পর রূপটির মা এসে বললেন, "মনু-তনু, এই নাও তোমাদের বল। তোমরা খেলোগে যাও।" তারপর সস্নেহে তনুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "তনু, রাগ কোরো না। তোমাদের বলটা রূপটির খুব ভাল লেগে গেছে। তাই ও ওরকম করছে। ওর তো এ-রকম বল নেই। এমন বল ও পাবেই বা কোথায় ?"

পিসিমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। চোখ মুছে তিনি মনুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "আমরা কাল সকালে চলে যাব। তোমরা বলটা লুকিয়ে রেখে দাও। বল দেখলেই তোমাদের ভাই বায়না করবে। ও যখন সকালে ঘুম থেকে উঠবে, বলের কথা ওর আর মনে থাকবে না।"

মনু-তনু বল নিয়ে ঘুমোতে গেল। খুব সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখল বিছানার নীচে, যাতে বলটা রূপটি দেখতে না পায়।

পরদিন সকালে পিসিমারা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। রূপটি বাবার কোলে, পিসিমা মার হাত ধরে কথা বলছেন। তাঁর গলায় কান্নার সুর। তিনি বলছেন, "আবার কবে দেখা হবে বৌদি, কে জানে। ভগবানের যদি ইচ্ছে হয় আবার আসব। মনু-তনু ভারী লক্ষ্মীছেলে, ওদের জন্যে খুব খারাপ লাগছে।"

মনু-তনুর বাবা একটা সুন্দর প্যাকেট এনে রূপটির হাতে দিলেন। এর মধ্যে একজোড়া ভাল জামা-প্যাণ্ট আছে। মা এনে দিলেন আরও সুন্দর একটি প্যাকেট। তাতে আছে সুন্দর-সুন্দর সব ছবির বই, খাতা, রঙ-পেনসিল।

মনু-তনু কাছেই দাঁড়িয়েছিল। পিসিমা ওদের দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। হঠাৎ রূপটি চেঁচিয়ে ওঠে, "মা, আমার বল।"

দৌড়ে তনু ঘরের ভেতরে গিয়ে বলটা নিয়ে এল। রূপটির কোলে-রাখা সুন্দর প্যাকেট দুটো পিসির হাতে দিয়ে খুব যত্ন ও ভালবাসার সঙ্গে রূপটির হাতে বলটা ধরিয়ে দিল।

অনুবাদ : রমা ভার্মা

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কেষ্টকাকার কোনও উদ্বেগের লক্ষণ নেই

খুড়োর কল

সুনীল দাশ

আমাদের কেষ্টকাকা থাকতেন লণ্ডন শহরের পুবদিকে প্লেস্টো নামের একটি জায়গায়। এ-দেশের জন্যে কেষ্টকাকার দুটি কর্তব্য আমরা বরাবর দেখে এসেছি। একটি হল চার-পাঁচ বচ্ছর অন্তর একবার করে দেশে ফেরা, আর অন্যটি হল দেশে নিয়মিত চিঠি লেখা। ব্যস্। এ ছাড়া কোনও দায়দায়িত্বের ঝামেলাই নেই কেষ্টকাকার, একেবারে একলা মানুষটি, ডানা-মেলা পাখি। আমরা বলতাম, "কেষ্টকাকা, তোমার চেয়ে আর সুখী কে? আছ খাসা, খাস বিলেতে।"

এ-সব বললেই কেষ্টকাকার সঙ্গে-সঙ্গে জবাব, "ওই শুনতেই ভাল লাগে, এখন কি আর সে-লণ্ডন আছে রে! সব ঢনঢন্ করছে।"

এহেন কেষ্টকাকার সঙ্গে যখন খোদ প্লেস্টোতেই, একেবারে তাঁরই ঘরে, সাক্ষাৎকার হল, তখন আমার মালুম হল কেষ্টকাকার আসল বেচালটা কোথায়। বেচাল না-বলে উল্টো চালও বলা যায়।

একলা মানুষটি। লণ্ডন শহরে পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফে চাকরি। খেয়ে-পরে ফুর্তি করে তাঁর তো টাকায় গড়াগড়ি যাবার কথা! অথচ সতেরো বচ্ছর লণ্ডনে থেকে কেষ্টকাকার নাকি মাথার টাকটি ছাড়া আর কিছুই বাড়েনি। এ-সব বলে বেড়ানোর আসল উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কথায়-কথায় আত্মীয়রা তাঁর কাছে যেন না বড়গোছের চাঁদা চেয়ে বসে। অমুকের বিয়ে, তমুকের শ্রাদ্ধ ইত্যাদি আমাদের পেল্লায় জ্ঞাতিগুষ্টির হাজার কাজকর্মের দেয় কোটাটিকে, ওই অপপ্রচারের সাহায্যে কেষ্টকাকা বেশ কাট-ছাঁট করে যাচ্ছেন। শুধুই জমাচ্ছেন।

আমি একবার আচমকা যখন লণ্ডনে উড়ে গেলাম, এবং টিউবে চড়ে সোজা হাজির হলাম প্লেস্টোতে কেষ্টকাকার আস্তানায়, তখন মনে-মনে ঠিক করে নিয়েছি, এতকাল আমাদের নির্বোধ বানানোর শোধ তুলব। বললাম, "কেষ্টকাকা, তোমার এখানে আমি পুরো একটা মাস থাকতে চাই, তোমার অসুবিধে হবে না তো?"

কথাটা বলে আমি কেষ্টকাকার ভাবগতিক দেখার জন্যে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কাকা একটুও ঘাবড়ালেন না। উল্টে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "তোর ভিসার মেয়াদ যদ্দিন, তদ্দিনই তুই থেকে যা না আমার এখানে। আমারও বেশ মজায় কাটবে।"

পরদিন দুপুরের খাওয়ার সময় থেকেই টের পেলাম, কেষ্টকাকা আমার থাকায় কেন এত খুশি। দেখলাম, সকাল বেলায় উঠেই উনি ফোন তুলে গদ্গদ কণ্ঠে বলছেন, "হ্যালো নীতাবৌদি, অধম তোমাদের স্নেহভাজন, দাশগুপ্ত বলছি। তা আছ কেমন?"

ওপাশ থেকে নীতাবৌদিকে বেশি কথা বলার সুযোগ দিলেন না কেষ্টকাকা। কথার মাঝখান থেকেই বলতে শুরু করলেন, "কলকাতা থেকে আমার এক ভাইপো এসেছে। শোনো, ও আবার লেখে-টেখে। একটু আগেই ওকে বলছিলাম তোমার কথা। বলছিলাম, আমাদের নীতাবৌদি হলেন বাংলা সাহিত্যের একজন সত্যিকারের পাঠিকা। এই লণ্ডনে বসেও..."

একটু আগে কেষ্টকাকা মোটেই আমাকে ওসব বলেননি। তবে একটু পরেই বোঝা গেল, কেষ্টকাকা নীতাবৌদিকে অতশত বলছিলেন কেন। স্তুতিবাক্যের মাঝখানে কেষ্টকাকা আচমকা বলে বসলেন, "তা বৌদি, তুমি আমাদের লাঞ্চে ডাকছ না কেন? আজ আমরা দু'জনেই ফ্রি আছি। তোমার কোনও অসুবিধে নেই তো?...আসছি তাহলে?"

এরপর ফোনের রিসিভার রেখে কেষ্টকাকা আমার দিকে তাকিয়ে বিজয়গৌরবে বললেন, "আজকের ব্যবস্থা পাকা।

দেখবি কী দারুণ খাওয়ায়। কলকাতায় বসেও এমন বাঙালি খানা মেলা ভার।"

এই শুরু। তারপর থেকে রোজই চলল, পশ্চিম, মধ্য আর পূর্ব লণ্ডনের নানা বাঙালি বাড়িতে খানার ধুম। কখনও শুধু লাঞ্চ, কখনও দু'বেলারই নেমন্তন্ন জোটানো চলল জনে-জনে ফোনে-ফোনে ব্যবস্থা পাকা করে।

"কী খবর মাসিমা? আপনাদের একান্ত স্নেহভাজন, এই অভাগা দাশগুপ্তকে মাসিমা এতকাল ভুলে থাকলেন কী করে! ওঃ আপনার হাতে সেই ভাঁপানো মাছ খেয়েছিলাম, একটু আগেই বলছিলাম আমার এক ভাইপোকে···হ্যাঁ, কলকাতা থেকে এসেছে। আমি তো জানি, আপনাকে বললেই খাওয়াবেন। ···অ্যাঁ! আজ থাকছেন না? ঠিক আছে, ঠিক আছে, কালকেই খাওয়া যাবে, কেমন?"

রিসিভার নামিয়ে খানিকটা ক্ষুণ্ণ গলায় কেষ্টকাকাকে বলতে শোনা যায়, "আসছে কালকেরটা নয়তো পাকা হল, কিন্তু আজকেরটা কী হবে?"বলতে বলতে খাতা খুলে আর-একটা নাম্বারে ডায়াল করতে শুরু করে দিলেন।

"হ্যালো, মিসেস ব্যানার্জি? ···আমি প্রেস্টোর দাশগুপ্ত বলছি। কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি অনেককাল আর খেতে-টেতে বলছেন না কেন? জানেন তো, কলকাতা থেকে আমার এক লেখক-ভাইপো এসেছে। তাকে আপনার অতুলপ্রসাদীর কথা বলার পর থেকে সে রোজই তাড়া দিচ্ছে আপনার গান শুনতে যাবে বলে।"

এরপর ওপাশ থেকে আহারের আহ্বান আনতে আর বিলম্ব হল না। আর এইভাবে যত দিন যেতে লাগল, ততই আমি অবাক হতে থাকলাম কেষ্টকাকার অতি পরিচিতর তালিকা দেখে। ফুরোয় না। টিউবের সাত দিনের শস্তা টিকিট তো সঙ্গে থাকেই, তাই মহানন্দে লণ্ডনের চর্তুদিকে খেয়ে-খেয়ে বেড়াতে লাগলাম। এইভাবে তন্নতন্ন করে নেমন্তন্ন ফাঁদতে-ফাঁদতে কেষ্টকাকা একদিন নিজেই পড়ে গেলেন ফাঁদে।

সেদিন একটা অনুষ্ঠান ছিল বেঙ্গলি ক্লাবে। সেখানে নীতাবৌদি, মাসিমা, মিসেস ব্যানার্জি থেকে শুরু করে, এক মাস ধরে আমাদের যাঁরা খাইয়েছেন, তাঁদের বেশিরভাগই উপস্থিত। একটা সময় দেখা গেল, তাঁরা একরকম জোট বেঁধেই বলা যায়, ছেঁকে ধরলেন কেষ্টকাকাকে। সকলেরই এক কথা। "এই যে আমাদের প্রেস্টোর কেষ্ট, পরম স্নেহভাজনেষু, তোমাকেই খুঁজছিলাম চাঁদ। বলো, আমাদের সকলকে একসঙ্গে কবে খাওয়াচ্ছ? চটপট বলে ফ্যালো দিনক্ষণ।"

সর্বনাশ! এরা বলে কী? কমপক্ষে বিশজন। বিশজনকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে কেষ্টকাকাকে! এ একেবারে, যাকে বলে কিনা গভীর ষড়যন্ত্র! বোঝো এখন ফুরফুরিয়ে নেমন্তন্ন যোগাড় করার ফ্যাচাং!

কিন্তু অবাক কাণ্ড! তাকিয়ে দেখলাম, ওই রকম ভয়ঙ্কর দাবির মুখেও কেষ্টকাকার মুখের হাসিটি অভয় অরণ্যের হরিণের মতো ঠোঁটের ওপর চরে বেড়াচ্ছে। কেষ্টকাকা হাসতে হাসতে বললেন, "সে তো আনন্দের কথা। আসুন, সামনের রোববারই আসুন সকলে।"

মনে-মনে কেষ্টকাকার জন্যে আমার কষ্ট হল। সামনের রবিবারে অনেক পাউণ্ড খসবে বেচারার। ফেরার পথে বললাম, "সবাইকে তো আসতে বলে দিলে, এখন ওই আঠেরো-বিশ জনের রান্নার হ্যাপা সামলাবে কে?"

কেষ্টকাকা নিঃশব্দে হেসে বললেন, "দেখে যা না চুপচাপ।"

কেষ্টকাকার আস্তানায় মজুত বলতে যা-কিছু আছে, তা হল চাল। কিন্তু বিশজন অতিথিকে তো শুধু ভাত ধরে দিলে চলবে না। কত কী যোগাড়যন্ত্রের দরকার। কিন্তু কেষ্টকাকার কোনও উদ্বেগের লক্ষণ দেখা গেল না।

দেখতে-দেখতে শনিবার এসে গেল। আমিই তাড়া দিলাম। "কালই তো আসছে সবাই—ভুলে গেলে নাকি?"

"ভুলব কেন? আসতে দে না! আমি ওদের স্নেহভাজন।"

"কেনাকাটা করবে তো?"

কেষ্টকাকার ঠোঁটে এবার রহস্যময় হাসি। আমি আঁতকে উঠে বলি, "সর্বনাশ! ঘরে তালা দিয়ে কেটে পড়বে নাকি?"

"সেটা তুই পারিস, আমি কি পারি? লণ্ডনে আমায় থাকতে হয় তো।"

"তাহলে? করবেটা কী? তুমি কি অসুখের ভান করে বিছানায় পড়ে থাকবে?"

"দ্যাখ না কী করি। অত ভাবছিস কেন?"

শনিবার সন্ধের পর কাকা আবার তাঁর ফোন নিয়ে বসলেন। সামনে নিমন্ত্রিতদের ফোনের লিস্ট।

"হ্যালো, মিসেস ব্যানার্জি? আসছেন তো দু'জনে? সব আয়োজন পাকা। শুধু একটা ব্যাপার মিসেস ব্যানার্জি ওই মাছভাজাটা আমি কিছুতেই সামলাতে পারছি না। তাই ভাবলাম, আপনিই একমাত্র পারেন আমায় উদ্ধার করতে। এই পনেরো-বিশজনের মতো আর কি। ···তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হচ্ছি তো? আসার সময় মাছভাজাটা আপনি সঙ্গে নিয়ে আসছেন, কেমন?"

ফোন নামিয়ে কেষ্টকাকা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এরপর আবার রিসিভার তুলে অন্য নাম্বার ঘোরালেন, "হ্যালো, মাসিমা, কাল ঠিক সময়ে আসবেন কিন্তু। দেখবেন, আমার মাছভাজাটা পর্যন্ত কেমন পাকা হাতের হয়। ···না না, আগে আসার দরকার নেই। শুধু মাসিমা, বুঝলেন কিনা, ওই চাটনিটা, ওটা যদি আপনি একটু ম্যানেজ করে আনতে পারেন। ···আনছেন? আপনাকে যে কী বলে···"

এরপর প্রায় আগের বয়ানেই নীতাবৌদিকে বলা হল, "শুধু, বুঝলে তো বৌদি, ওই মাংসটা ঠিক সামাল দিতে পারছি না। মাংসটা তুমি যদি একটু ভেজে দিতে···"

"মাংস ভেজে দিতে মানে?"

"ভেজে দিতে মানে পাঠিয়ে দিতে আর কি। রান্না করে তোমার সঙ্গেই নিয়ে এসো না হয়! ···ওহ্, থ্যাঙ্কস—"

মোটামুটি সবরকম পদের জন্যে ফোন হয়ে যাওয়ার পর কেষ্টকাকা এবার নিরাপদ হাসি হেসে বললেন, "ভাতটা তোর কাকা না হয় প্রেস্টোতেই রাঁধবে, কী বলিস?"

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, "স্নেহভাজনের বাড়িতে সকলের ভোজন ভালই জমবে মনে হচ্ছে।"

ছবি অনুপ রায়

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধাঁধা

এবারে যেটা প্রথম ধাঁধা দেব, সেটা তোমাদের পক্ষে কতটা ধাঁধা হবে জানি না, কিন্তু আমার পক্ষে ওটা কাজ। অবশ্যকরণীয় এক কাজ।

ব্যাপারটা বরং খুলেই বলি। ছোট্‌কার কাছে সেদিন ইংরেজি খাতা দেখাতে গিয়ে দারুণ বকুনি খেলাম। একটা প্রশ্নে ছিল, প্রোনাউন দাগ দিতে হবে। সেখানেই আমি গোলমাল করে ফেলেছি। বেশ কিছু সেনটেন্সে প্রোনাউন ছিল একাধিক। আমি একটা করে দাগ দিয়েছি। ফলে, ছোট্‌কার বকুনি। আর সেই সঙ্গে নতুন করে প্রোনাউন সম্পর্কে চ্যাপটারটা ছোট্‌কা পড়িয়ে দিল। আর যা দিল, সেইটাই তোমাদের দেব এবার। ছোট্‌কা অবশ্য এটাকে ধাঁধা বলেই দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি এটা ভুলের মাশুল। আর এটা এমনই এক প্রশ্ন যার উত্তর করতেই হবে। তাই কাজ ছাড়া আর কী বলব।

সুতরাং এসো। তোমরাও করো, আমিও করি।

ওহো, তার আগে জেনে নেওয়া দরকার, ইংরেজিতে প্রোনাউন কাকে বলে সেটা তোমরা জানো তো? কী বললে? সবাই জানো। প্রপার নাউনের বদলে যে-নাউন ব্যবহার হয় তাকেই বলে প্রোনাউন—সংক্ষেপে এই তো বলে। কে জানে বাবা, এটাও ঠিক হল কি না। বকুনি তো খাওনি ছোট্‌কার। খেলে বুঝতে। যাক, ব্যাপারটা বলি।

প্রথম ধাঁধা ॥ ইংরেজিতে এমন দশটা প্রোনাউনের তালিকা বানাতে হবে যার প্রথমটা হবে এক অক্ষরের, দ্বিতীয়টা দু-অক্ষরের, তৃতীয় তিন অক্ষরের, চতুর্থ চার অক্ষরের ইত্যাদি। এইভাবেই চলবে। দশ পর্যন্ত। দশম হবে দশ অক্ষরের। কী, বুঝে গেলে তো? নাও, এবার লেগে পড়ো।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ সাত অক্ষরের এমন একটা চেনা ইংরেজি শব্দ বলতে হবে, যার প্রথম দু-অক্ষর যদি পুরুষ-সংক্রান্ত, প্রথম তিন অক্ষর কোনও মহিলা-সংক্রান্ত। প্রথম চার অক্ষর যদি বোঝায় কোনও বীরপুরুষকে, পুরো সাত অক্ষর বোঝায় এক বীরাঙ্গনাকে। শব্দটা কী?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—শ্যায়নমামা

গতবারের উত্তর ॥ (১) ব্ল্যাকবোর্ড। (২) জানলা দিয়ে তাকিয়ে। (৩) SIXTY।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		■	২	■	৩	৪
	■	৫		৬	■	
	■		■		■	
■	■	৭			■	■
৮			■	৯		১০
	■	■	■	■	■	
১১			■	১২		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) পাখি ওড়ে কিসের জোরে? (৩) প্রাচীন শিকারি জাতিবিশেষ। (৫) সীতাকে ভোলাতে গেলি, রামের হাতে অক্কা পেলি। (৭) পায়রা। (৮) শূন্যস্থান পূরণ করো : — তোর পেখম কই? (৯) ফুলের রেণু। (১১) কণিষ্কর মূর্তিটা কেমন? (১২) বেদ যখন অকর্মণ্য।

উপর-নীচ : (১) 'মহাভারতের কথা অমৃতসমান'—কোন্ ছন্দে লেখা? (২) হাতি। (৪) শরীরে রক্ত-সঞ্চালনের জন্য যার প্রয়োজন। (৫) সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজকের ভিক্ষা। (৬) চাঁদোয়া। (৮) জল বয়ে নিয়ে যায়, সুযোগ পেলেই কামড়ায়। (১০) স্বর্গের গায়ক-সম্প্রদায়।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

স	র	যূ	■	ঈ	গ	ল
রো	■	প	টা	শ	■	গু
ব	ক্তা	■	ক	■	শু	ভ
র	■	হা	ডু	ডু	■	গু
■	পা	■	মা	■	বি	■
■	ট	■	ডু	■	মা	■
চু	নি	■	ম	■	ন	ন্দী

মজার খেলা

বারোটা টুথপিক যোগাড় করো, নয়তো ব্যবহৃত দেশলাইকাঠি বারোটা। এবার টেবিলের ওপর কাঠিগুলোকে নীচের ছবির মতো সাজাও—

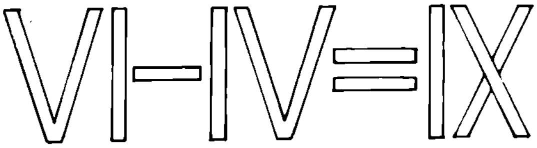

সাজিয়েছ ?

এবার তাকিয়ে দ্যাখো। রোমান হরফে লেখা একটা অঙ্ক। ছয় থেকে চার বিয়োগ করে হয় নয়। কী, হাঁ-হাঁ করে উঠছ কেন ? ভুল অঙ্ক বলে ? জানি।

আরে বাবা, সেটাই তো খেলা। খেলাটা বরং শোনো।

একটা কাঠি সরিয়ে ফের এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে কিনা এই ভুল অঙ্কটা একটা ঠিক অঙ্ক হয়ে ওঠে। সেই কাজটা করবে তোমার বন্ধু। তুমি শুধু এই বাজে অঙ্কটা তার সামনে ধরে দেবে।

তবে হ্যাঁ, বন্ধু যদি মাথা চুলকে বলে, পারব না, তুমি করে দেখাও, তখন ? তখন তুমি কী করে কী করবে, সেটা বরং এখন থেকেই ভাবতে শুরু করো। অর্থাৎ নিজে-নিজে কাঠি সরাও, ফের বসাও, তারপর দ্যাখো। ঠিক অঙ্ক হচ্ছে কি না।

যদি ঠিক-ঠিক কাঠি সরাতে পারো তাহলে কী হবে, সেই ছবিটা নীচে দেওয়া রইল। এখন তা বলে এটা দেখা চলবে না।

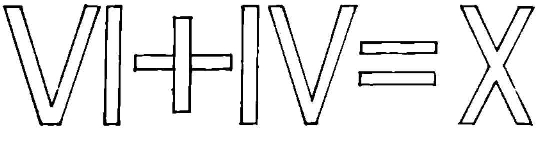

মজারু

হাসিখুশি

"বলছেন নদী থেকে এইমাত্র একটি ডুবন্ত ছেলেকে আপনি তুলে এনেছেন। কই আপনার জামাকাপড় ভিজে দেখছি না তো।"

"এতক্ষণ উত্তেজনায় রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। তাতেই শুকিয়ে গেছে বোধহয়।"

"আপনিই স্যার প্রথম গোয়েন্দা—যিনি আমাদের রেস্তোরাঁতে খেতে এলেন।"

"তাই নাকি ! কী করে বুঝলে আমি গোয়েন্দা ?"

"যেভাবে স্যার আপনি কাটলেটটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখছিলেন, তাতেই।"

"শুনলাম, তুমি নাকি নতুন ঘড়ি কিনেছ ?"

"না তো ! তোমার চুরি-যাওয়া ঘড়িটা ভালই সময় দিচ্ছে।"

"কাল রাত্রে আমি একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম। রাত্রে সূর্য উঠেছে আকাশে, কী চমৎকার রোদ্দুর..."

"এতদিন জানতাম তুমি লেখা চুরি করো। এখন দেখছি স্বপ্নও চুরি করছ !"

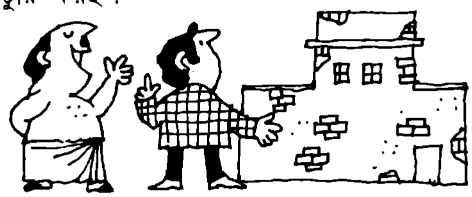

ভাড়াটে : আপনার বাড়ির দেওয়াল থেকে পলস্তরা খসে পড়ছে।

বাড়িওয়ালা : এ মাসের মধ্যে বাড়ি না ছাড়লে যাতে ইট খসে পড়ে তার ব্যবস্থাও করব।

"এবারে শিকারে গিয়ে একটা বড় বাঘ শিকার করেছি। একটা গুলি চোখের উপর, আরেকটা বুক ভেদ করে চলে গিয়েছিল।"

"সে কী ! এত তাড়াতাড়ি শিকারকাহিনীটা পড়ে শেষ করে ফেললে ?"

"আমাদের কাজের ছেলেটা বাজার করে এসে খুচরো পয়সাগুলো ফেরতই দিতে চায় না। দেব নাকি তাড়িয়ে ?"

"না, না। তা করবেন কেন ? ওকে তো এইভাবেই শেখবার সুযোগ দিতে হবে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

খামখেয়ালি খাম

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

জুলাই মাসে লেখা চিঠি
নভেম্বরে মিলতে
রাজেনবাবু রাগের চোটে
পিয়নকে যান গিলতে ।
বলেন, "ওহে, মামদোবাজির
পাওনি খুঁজে জায়গা ?
এমন ঠুকে দেগা, তোমার
চাকরি ছুটে যায়গা ।
বয়েস হলেও দেখছি তোমার
দায়িত্বজ্ঞান নাস্তি,
চিঠি লেট-এর জন্যে তোমার
হওয়া উচিত শাস্তি ।"
পিয়ন বলে, "চটেন কেন,
লেট সাধে আর হয় কি ?
লেট না হলে লেটার ওকে
শুধু-শুধুই কয় কি ?
খাম যদি পান খুব দেরিতে
সে-দোষ আমার নয় তো,
দোষটা খামের, খামেরা খুব
খামখেয়ালি হয় তো !"

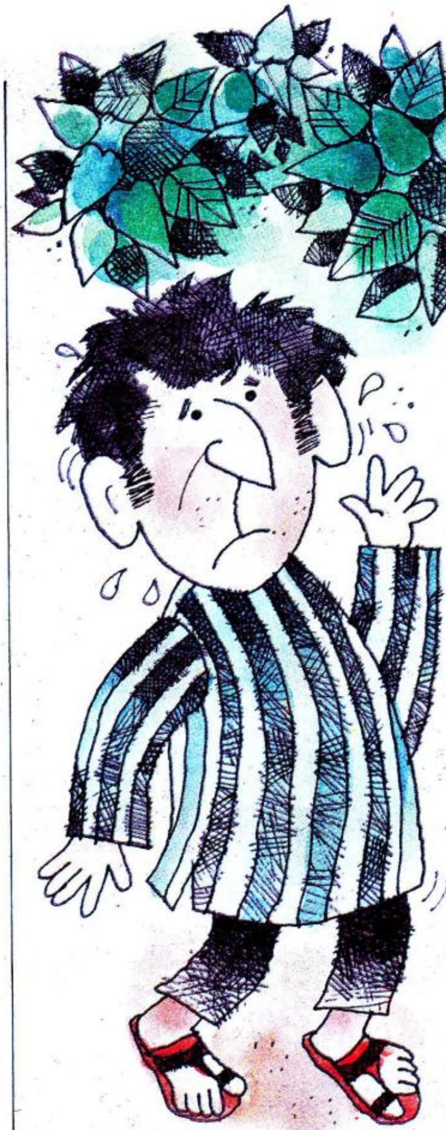

ভরদুপুরে

ঝুমকা ভাদুড়ী

পঞ্চা তখন ঘুমোচ্ছিল খাটে ।
রোজ দুপুরে নির্জনে সে হাঁটে ;
দুপুর মানে ঠিক বারোটা নয়—
একটা যখন সাতচল্লিশ হয় ।
হঠাৎ অ্যালার্ম বাজল কানের কাছে
লাফিয়ে ওঠে, বিলম্ব হয় পাছে ।
গলিয়ে পায়ে হাওয়াই জুতোটাকে
হাঁটতে থাকে শাল-মহুয়ার ফাঁকে ।
পেছন থেকে হঠাৎ বাজে খড়ম ;
শুধাল কেউ—"লাগছে বুঝি গরম ?"
পঞ্চা তখন পেছনপানে তাকায়—
কেউ কোথা নেই, শূন্যতা চোখ পাকায় !
শিউরে ওঠে পঞ্চাননের গা-টা,
সেদিন থেকেই বন্ধ দুপুর-হাঁটা ।

ও, বুঝেছি

হিমাংশু জানা

ও, বুঝেছি, আপনি তো সেই
ভুবনবিজয় শর্মা—
বছর তিনেক আগেই বোধহয়
গিয়েছিলেন বর্মা ?
ছিলেনও তো মাস ছ-সাতেক
মিনিকয় ও নেপালে,
মামার বাড়ি আপনারই না
মেদ্‌নীপুরের দেপালে ?
মেসো দীনবন্ধু সাহা
কেমন আছেন টাটাতে ?
এখনও কি ছেলেটি তাঁর
ম্যাজিক দেখায় বাটাতে ?
সেজো নাতি কী পাশ দিল ?
পড়ছে সবে নাইনে ?
কী শুধোলেন ? গানের কথা ?
ইদানীং গান গাইনে ।
ভুগছি তো খুব হাঁচির ব্যামোয়,
সুর খেলে না গলাতে ।
নাচি একটু-আধটু এই যা,
আছি ? মহেশতলাতে ।

ছবি : দেবাশিস দেব

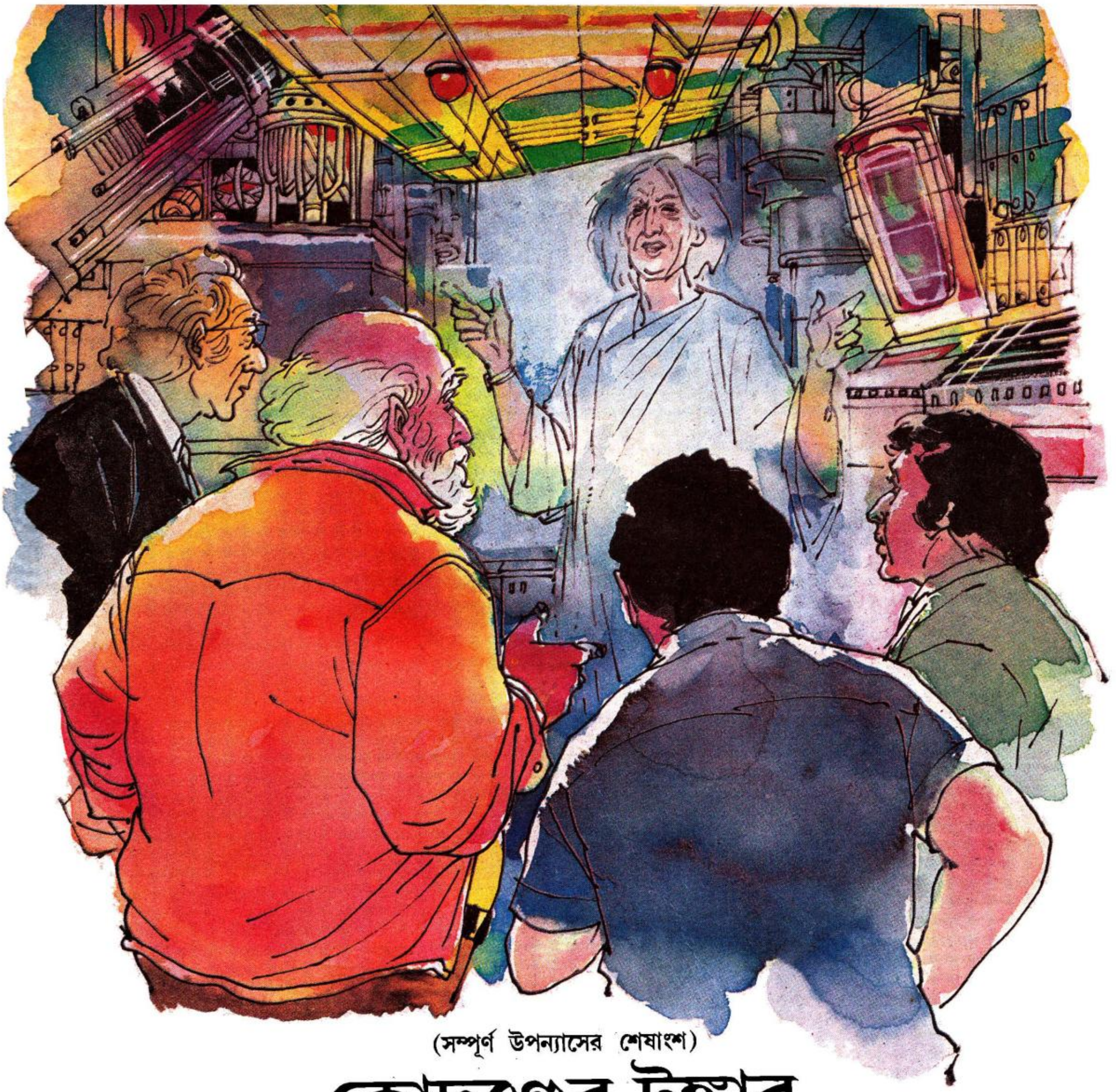

(সম্পূর্ণ উপন্যাসের শেষাংশ)

কোদণ্ডের টঙ্কার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

॥ চার ॥

প্রদীপবাবু চমকে উঠে বললেন, "বংকারাম ! কী আশ্চর্য !" কর্নেল বললেন, "চেনেন নাকি বংকারামকে ?"

"চিনতুম—খুবই চিনতুম," প্রদীপবাবু অবাক হয়ে বললেন। "ওঁকে এখানকার লোকে বাবু বংকারাম সেনাপতি বলে জানত। রাজাগজা লোক বললেই চলে। পুরনো কোদণ্ডগিরিতে ওঁর বাড়ি। ওঁর পূর্বপুরুষেরা নাকি এই কোদণ্ডগিরি পরগনার শাসক ছিলেন। পরে রাজত্ব ঘুচে গিয়েছিল ইংরেজের কোপে পড়ে। সেটা ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার ঘটনা। যাই হোক, বাবু বংকারাম ছিলেন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। পুলিশের খাতায় খুনে ডাকাত বলে নাম লেখা ছিল। কিন্তু পুলিশ ওঁকে কিছুতেই ধরতে পারছিল না। গত বছর মার্চ মাসে জঙ্গলের ভেতর একটা ঝরনার কাছে দেখি, একটা খাকি পোশাক পরা লোক রাইফেল হাতে নিয়ে বসে আছে। এ জঙ্গলে শিকারের পারমিশান দেওয়া হয় না। তাই সোজা গিয়ে চার্জ করলুম। লোকটা আমাকে গ্রাহ্যই করল না। বলল, 'আমি কে জানো ? বাবু

বংকারাম সেনাপতির নাম শুনেছ ? আমি সেই।' শুনে তো ভয় পেয়ে গেলুম। ওঁকে ঘাঁটাতে সাহস হল না। তাছাড়া আমি নিরস্ত্র এবং একা ছিলুম। তাই চুপচাপ চলে এলুম। দিন-দুই পরে হঠাৎ বাবু বংকারাম সন্ধ্যার সময় আমার এই বাংলোয় হাজির। তাঁকে খাতির করে বসালুম। বাবু বংকারাম বললেন, আমার ওপর খুব খুশি হয়েছেন। কারণ পুলিশের কানে তুলিনি যে, ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এখন আসল কথাটা হল, জঙ্গলের ভেতর ওঁর কিছু গোপন কাজকর্ম আছে। জঙ্গলের রেঞ্জার বা গার্ডদের যেন আমি সাবধান করে দিই, ওঁকে কেউ দেখতে পেলেও যেন না ঘাঁটায় এবং পুলিশের কানে না তোলে। আদিবাসীরা ওঁর ভক্ত। কাজেই তারা ওঁর বিরুদ্ধে কিছু করবে না।"

প্রদীপবাবু দম নিয়ে ফের বললেন, "তার কিছুদিন পরে সেই ঝরনার ধারে বাবু বংকারামের ডেডবডি পাওয়া গেল।"

কর্নেল নড়ে বসলেন। বললেন, "ডেডবডি ?"

"হ্যাঁ। গলায় একটা মিহি নাইলনের দড়ির ফাঁস আটকানো। জিভ বেরিয়ে রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, দড়িটা অন্তত সাত-আট মিটার লম্বা। কেউ যেন অতটা দূর থেকে হ্যাঁচকা টানে শ্বাস রুদ্ধ করে ওঁকে মেরে ফেলেছে।"

আমি বললুম, "আত্মহত্যা নয় তো ?"

প্রদীপবাবু জোর গলায় বললেন, "কক্ষনো নয়। অমন মিহি দড়ি—প্রায় সুতোই বলতে পারেন, তা দিয়ে আত্মহত্যা করা যাবে কীভাবে ? গাছের ডালে বেঁধে ঝুলে পড়লেই তো ছিঁড়ে যাবে। তাছাড়া জায়গাটা ফাঁকা। ঝোপঝাড় অবশ্য আছে প্রচুর। কিন্তু কাছাকাছি দশ-বারো বর্গমিটারের মধ্যে কোনও উঁচু গাছই নেই।"

কর্নেল বললেন, "রাইফেলটা ?"

"ওঁর রাইফেলটার কথা বলছেন কি ? নাঃ, ওটা পাওয়া যায়নি। যে ওঁকে ফাঁস আটকে মেরেছিল, সম্ভবত সেই নিয়ে পালিয়েছিল। পুলিশের সন্দেহ, কাজটা গোপেশ্বর নামে ওঁর এক স্যাঙাতের। সেও সাংঘাতিক লোক।"

কর্নেল দাড়ি চুলকে বললেন, "তাহলে দেখা যাচ্ছে, পাখিটার কথা যদি সত্যি হয়, গঙ্গারামকে বংকারাম খুন করেছিল এবং শেষে বংকারামকেও কেউ খুন করল।"

আমি বললুম, "গঙ্গারামের অনুগত গোপেশ্বর প্রতিশোধ নিয়ে থাকবে।"

প্রদীপবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "মামাবাবু যদি পাখিটার কথা বুঝতে ভুল না করতেন, তাহলে বাবু বংকারামের হত্যা-রহস্য নিয়ে উঠে-পড়ে লাগতেন।"

কর্নেল বললেন, "আপাতত আপনার মামাবাবু গঙ্গারামের হত্যা-রহস্য নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন। দেখা যাক, কত দূর এগোতে পারেন। তবে এটুকু বলতে পারি, শেষপর্যন্ত বংকারামের হত্যা রহস্যেই জড়িয়ে পড়বেন হালদারমশাই—বিশেষ করে সাধু, পাখি আর বাঁদরের নাগাল যখন পেয়ে গেছেন।"

"সাধু, পাখি আর বাঁদর ? সে আবার কী ?"

কর্নেল সংক্ষেপে ঘটনাটা বললেন। শোনার পর প্রদীপবাবু খুব অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, —সাধুর ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি আশ্চর্য, জানেন ? ইদানীং সারা এলাকা জুড়ে খালি ওই নিয়ে আলোচনা। যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই বলবে, সে স্বচক্ষে দেখেছে এক সাধুবাবা হঠাৎ তার সামনে দেখা দিয়েই নাকি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন।"

কর্নেল বললেন, "আপনার মামাবাবুও নাকি দেখেছেন স্বচক্ষে !"

"হ্যাঁ, —মামাবাবু নাকি জঙ্গলের ভেতর সেই ঝরনার কাছে দেখেছেন। আর লোকেরা দেখেছে রাস্তাঘাটে, বাড়ির দরজায়, কিংবা নিরিবিলি গাছতলায়। এমন কী, আমার রাঁধুনি হলধর ঠাকুর দেখেছে কিচেনের জানালার বাইরে। ডাকব নাকি ওকে ?" প্রদীপবাবু হাসতে লাগলেন।

"না, থাক," কর্নেল বললেন। "ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ?"

প্রদীপবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "সমস্যা হচ্ছে, মামাবাবুকে অবিশ্বাস করতে বাধছে। নইলে নিছক গুজব বলেই উড়িয়ে দিতে পারতুম। মামাবাবু অবশ্য ভুল দেখতে পারেন, তাও ঠিক। তবে ঝরনার ওখানে পাহাড়ের ওপর এক সাধুকে নাকি আমাদের গার্ডরা কয়েকবার দেখেছিল। অদৃশ্য হতে দেখেনি যদিও। কিন্তু—"

কর্নেল বললেন, "কিন্তু ?"

প্রদীপবাবু একটু হাসলেন। "ওই ঝরনা সম্পর্কে এখানে খুব ভয়ঙ্কর সব গল্প আছে। জায়গাটা নাকি ভূতের বাথান। রাতবিরেতে আলো-টালো দেখা যায়। হ্যাঁ, আলো আমি নিজেও দেখেছি কয়েকবার। কিন্তু কাল দিনদুপুরে একটা ব্যাপার দেখে খুব অবাক হয়ে গেছি।"

কর্নেল সোজা হয়ে বসে বললেন, "বলুন।"

"কালকের ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য, জানেন ?" প্রদীপবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন। "তখন প্রায় একটা বাজে। সবে খাওয়াদাওয়া করে এই বারান্দায় এসে বসেছি, হঠাৎ দেখি কী—" বলে উনি হাত বাড়িয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আঙুল নির্দেশ করলেন। "ওই যে ছুঁচলো অদ্ভুত গড়নের পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন—নীচের দিকটা কতকটা পিরামিডের মতো আর মাথাটা গির্জার চূড়া বা মিনারের মতো উঠে গেছে ?"

দেখতে দেখতে বললুম, "কী আশ্চর্য ! আমি তো ওটা পাহাড়ের ওপর বাদশাহি আমলের কোনও মসজিদের মিনার বলে ভাবছিলুম। আগ্রার কাছে ঠিক এমনি একটা স্থাপত্য দেখেছি।"

প্রদীপবাবু বললেন, "না। ওটা একটা প্রাকৃতিক স্থাপত্যই বলতে পারেন। লক্ষ করে দেখুন, পাহাড়টা যেন বাণলাগানো বিশাল একটা ধনুক। কোদণ্ড মানে ধনুক। স্বয়ং শিবের ধনুক। আর গিরি হল পাহাড়। ওই পাহাড়টারই নাম তাই কোদণ্ডগিরি। তাই থেকে এলাকা এবং জনপদটার নামও হয়েছে কোদণ্ডগিরি। তা গতকাল বেলা একটা নাগাদ হঠাৎ দেখি কী, ওই ছুঁচলো চুড়ো থেকে একটা গোলমতো প্রকাণ্ড জিনিস আকাশে ছিটকে গেল। ছাইরঙা মস্ত বড় একটা গোলা যেন। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সেটা ভেসে রইল আকাশে। তারপর নেমে এল চুড়োর মাথায়। তারপর আর দেখতে পেলুম না। ভাবলুম চোখের ভুল নাকি !"

কর্নেল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "একটা বাজে তখন ?"

"হ্যাঁ। প্রায় একটা।"

"জিনিসটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দেখেছিলেন !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ছাইরঙের গোলাকার জিনিস?"

"হ্যাঁ, প্রকাণ্ড। এখান থেকে ওই পাহাড়টার দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। ঝরনাটা আছে ঠিক তার নীচেই।"

"মিঃ রায়, আপনি নিশ্চয় চন্দ্র-অভিযানের লুনার মডিউলের ছবি দেখেছেন, কিংবা আমাদের দেশ মহাকাশে যেসব কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে, তাদেরও ছবি দেখেছেন?"

প্রদীপবাবু চোখ বড় করে বললেন, "মাই গুডনেস! আপনি—"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "আপনি সম্ভবত ওই ধরনেরই কোনও জিনিস দেখে থাকবেন। এমনও হতে পারে, জিনিসটা আধুনিক কোনও আকাশযান। তথাকথিত উড়ন্ত চাকি বা ফ্লাইং সসারের মডেলে তৈরি।"

"সে কী!" প্রদীপবাবু নড়ে বসলেন।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "কাল বেলা একটা নাগাদ কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দেখেছেন তো?" বলে পা বাড়ালেন ঘরের দিকে। "আমার ধারণা, আমি আপনাদের হয়তো একটা বিস্ময়কর ম্যাজিক দেখাতে পারব। অন্তত নিরানব্বুই শতাংশ চান্স আছে।" কর্নেল পরদা তুলে ঘরে ঢুকে গেলেন।

একটু পরে বেরিয়ে এলেন। হাতে গতকাল সকালে দেখা সেই হাড়ের টুকরো অথবা মাউথ অর্গান অথবা 'রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র' নিয়ে। চেয়ারে বসে বললেন, "দেখা যাক, কী ঘটে। মিঃ রায়, জয়ন্ত! তোমরা ওই ছুঁচলো পাহাড়টার দিকে লক্ষ রাখো। রেডি—ওয়ান, টু, থ্রি!"

আমাদের চোখের সামনে সকালবেলার উজ্জ্বল রোদে পাঁচ কিলোমিটার দূরের ওই পাহাড়ের ছুঁচলো ডগা থেকে একটা গোলাকার ধূসর রঙের প্রকাণ্ড জিনিস ছিটকে গেল আকাশে। স্থির ভেসে রইল। কর্নেল বললেন, "বেশিক্ষণ এই ম্যাজিক দেখানো ঠিক নয়। আরও কারুর চোখে পড়তে পারে। অতএব ম্যাজিকের খেলা সাঙ্গ হল। জয়ন্ত, এই খেলাটার নাম দিলাম, কোদণ্ডের টঙ্কার।"

গোলাটা নেমে এসে যেন চূড়ায় মিশে গেল। শ্বাস ছেড়ে বললুম, "হুঁ—PUSH PANEL A এবং PUSH PANEL B-এর জাদু। কোদণ্ডের টঙ্কার।"

"ঠিক বলেছ ডার্লিং!" বলে কর্নেল প্রদীপবাবুর দিকে ঘুরলেন। প্রদীপবাবু হতবাক হয়ে বসে আছেন।

উনি মুখ খুলতে যাচ্ছেন, এমন সময় ওঁর মালী এসে সেলাম দিয়ে বলল, "গেটের কাছে এই চিঠিঠি লটকানো ছিল, স্যার।" প্রদীপবাবু চিঠিটা খুলে পড়ে ভীষণ গম্ভীর মুখে কর্নেলকে এগিয়ে দিলেন। উঁকি মেরে দেখি, ইংরেজিতে যা লেখা আছে, তার মানে হল: '**তোমার আঙ্কেলকে আমরা আটকে রেখেছি। রাত দশটায় ঝরনার কাছে একা দেখা করবে। তখন কথা হবে। সাবধান, গণ্ডগোল বাধানোর মতলব করলে আঙ্কেলের মুণ্ডু উপহার পাবে।**'

॥ পাঁচ ॥

বেনামী চিঠিটা পেয়ে প্রদীপবাবু খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। কর্নেল ওঁকে আশ্বাস দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ডঃ সীতাকান্ত পটনায়ক দুপুরের আগে এসে পৌঁছুতে পারবেন বলে মনে হয় না। ততক্ষণ একটু ঘোরাঘুরির ইচ্ছে হয়েছিল

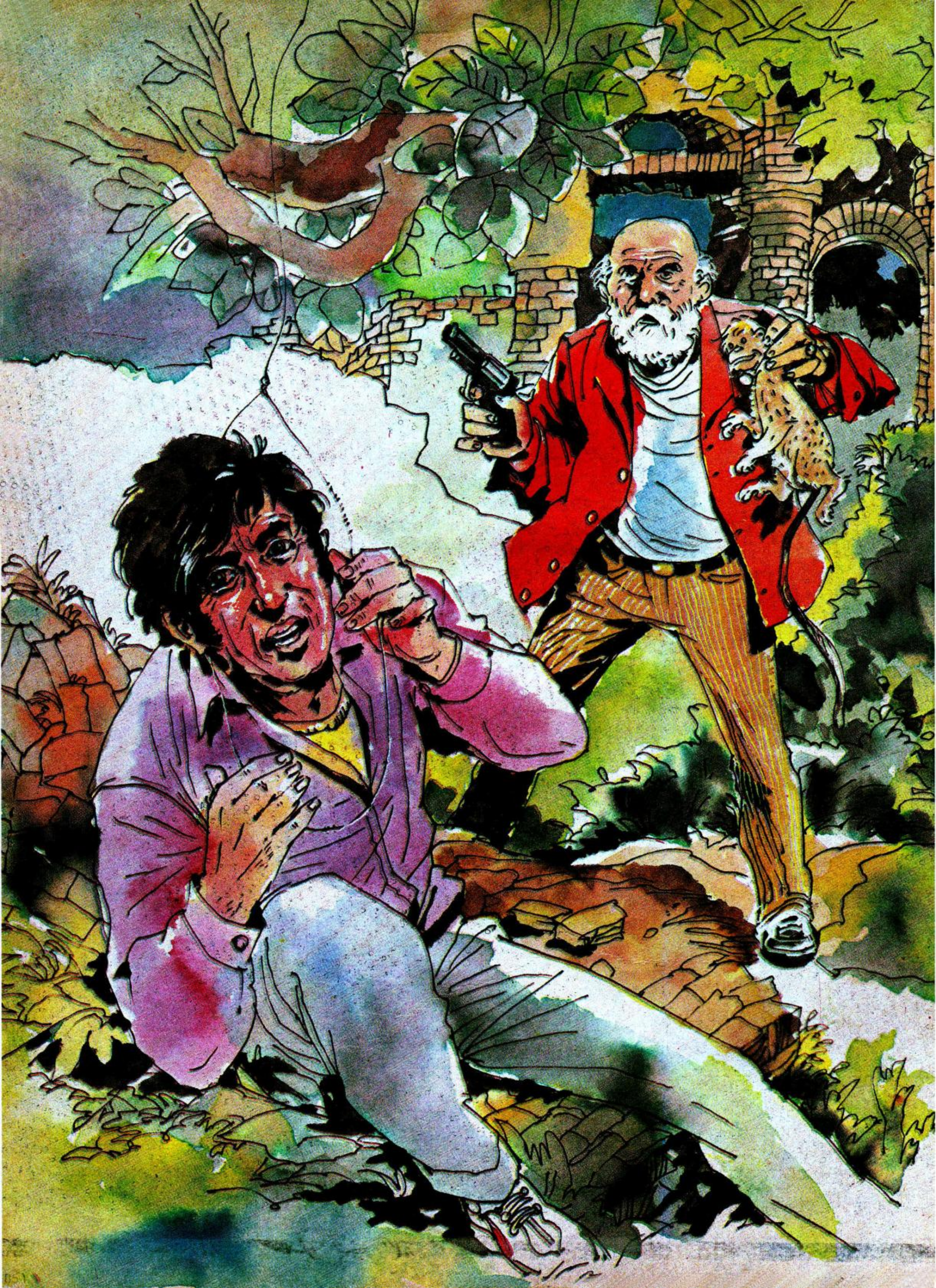

কর্নেলের। রাস্তায় একটা খালি অটোরিকশো পাওয়া গিয়েছিল। পুরনো কোদণ্ডগিরিতে পৌঁছে কর্নেল হিন্দিতে রাস্তার একটা লোককে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবু বংকারাম সেনাপতির বাড়িটা কোথায় ?"

লোকটা অবাক হয়ে আমাদের দেখতে দেখতে বলল, "বাবু বংকারাম তো মারা গেছেন গত বছর।"

"জানি। তাঁর বাড়িতে তো লোকজন আছে।"

লোকটা আরও অবাক হয়ে বলল, "কেউ নেই। আর বাড়ি তো শুধু নামেই। চলে যান সিধে রাস্তা ধরে। জঙ্গলের ভেতর ভাঙা দালানবাড়ি দেখতে পাবেন।"

গ্রামটা এক সময় হয়তো সমৃদ্ধ ছিল। এখন প্রায় জনহীন ছন্নছাড়া বসতি। যারা বাস করছে, তাদের বোধহয় অন্য কোথাও যাবার সুযোগ নেই। আগাছার জঙ্গল, ধ্বংসস্তূপ, তার মধ্যে একটা করে কুঁড়েঘর। কিছুটা যাওয়ার পর ডান দিকে গাছপালা আর ঝোপের ভেতর একটা ভাঙা দেউড়ি দেখা গেল। লতাপাতায় ঢাকা দেউড়ির পাশ দিয়ে সাবধানে এগিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলুম আমরা। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ঘরগুলোর বুকে ঘন আগাছা গজিয়ে উঠেছে। কর্নেল চারদিক দেখতে দেখতে আনমনে বললেন, "আশ্চর্য তো !"

জিজ্ঞেস করলুম, "আশ্চর্যটা কী ?"

কর্নেল একটু হাসলেন। "ডাকাত হওয়ার আগে বাবু বংকারাম নিশ্চয় এই বাড়িতে বাস করতেন। কিন্তু থাকার মতো আস্ত কোনও ঘর তো দেখতে পাচ্ছি না। লক্ষ করে দ্যাখো জয়ন্ত, এসব ঘর অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ভেঙে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"তাই হচ্ছে বটে, কিন্তু এই ভূতের আস্তানায় আপনার হানা দেওয়ার উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছি না।"

কর্নেল আমার কথার জবাব না দিয়ে পা বাড়ালেন। একটু তফাতে একটা ফোঁকর দেখা যাচ্ছিল। ফোঁকরটা লতাপাতায় প্রায় ঢাকা পড়েছে। আমি বারণ করার আগেই কর্নেল গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়লেন। অগত্যা আমিও ওঁকে অনুসরণ করলুম। একটা সুড়ঙ্গপথই বলা যায়। দিনদুপুরে আঁধার হয়ে আছে। একটু পরে সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল। একটা ছোট চত্বরে পৌঁছলুম আমরা। কর্নেল বললেন, "এদিকটাই ছিল বাড়ির অন্দরমহল।"

এখানেও একই অবস্থা। উঁচু সব ধ্বংসস্তূপ চারপাশে। আগাছা আর লতাপাতার ঝালরে ঢাকা। বুনো ফুলের কড়া গন্ধ মউমউ করছে এই ধ্বংসপুরীতে। পাখপাখালির ডাকও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কর্নেলের এখন পাখি দেখার মন নেই। এমনকী ওঁর দাড়ি ঘেঁসে প্রজাপতিও আনাগোনা করছে, যেন দেখতেও পাচ্ছেন না। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে ওপাশ থেকে একটা বটগাছের ডালপালা ঝুঁকে এসেছে আমার মাথার ওপর। হঠাৎ ওপর থেকে কী একটা জিনিস ধুপ করে আমার ঘাড়ে পড়ল। আঁতকে উঠে লাফ দিতেই গলায় হ্যাঁচকা টান এবং সঙ্গে-সঙ্গে দম আটকে এল। গোঁ গোঁ করতে করতে পড়ে গেলুম ঘাসের ওপর।

তারপর কানে এল গুলির শব্দ। তারপর মাথার কাছে কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম, "জয়ন্ত ! জয়ন্ত !"

আস্তে আস্তে উঠে বসলুম। তাকিয়ে দেখি, কর্নেলের হাতে

কতকটা কাঠবেড়ালির মতো দেখতে একটা খুদে বাঁদর। পিটপিট করে করে তাকাচ্ছে বাঁদরটা। কর্নেল তার কাঁধটা শক্ত করে ধরে রেখেছেন। তাই বাঁদরটার নড়াচড়ার সাধ্য নেই। আমাকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে কর্নেল বললেন; "জোর বেঁচে গেছ ডার্লিং ! আর একটু দেরি হলে বাবু বংকারামের অবস্থা হত তোমার। যাই হোক, গলার ফাঁসটা এবার খুলে ফেলো।"

এবার শিউরে উঠে দেখলুম, আমার গলায় মিহি নাইলনের সুতো জড়ানো। ব্যাপারটা বুঝতে এক সেকেণ্ডও দেরি হল না। কাঁপা-কাঁপা হাতে গলা থেকে সুতোটা খুলে ফেললুম।

কর্নেল বললেন, "ভাগ্যিস বাঁদরটাকে আগে দেখতে পেয়েছিলুম। তোমার মাথার ওপর ওই ডাল বেয়ে এগিয়ে আসছিল। ফাঁসটা নিয়ে যেই তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে, আমিও এক লাফে এগিয়ে ওকে ধরে ফেলেছি। তবে ফাঁস ধরে যে টান দিয়েছিল, তাকে দেখতে পাইনি। আন্দাজে রিভলভারের গুলি ছুঁড়ে তাকে ভাগিয়ে দিয়েছি। লোকটা সম্ভবত বটগাছের গুঁড়ির ওপর কোথাও বসে ছিল। কারণ তার লাফিয়ে পড়া আর দৌড়ে যাওয়ার ধুপধুপ শব্দ শুনতে পেয়েছি।"

উঠে দাঁড়ালুম। মাথা ঝিমঝিম করছে। কুৎসিত বাঁদরটার দিকে তাকাতেও আতঙ্ক হচ্ছে। ওই ব্যাটা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে ফাঁসটা আটকে দিয়েছিল আর ওর শয়তান মনিব নাইলনের শক্ত এই সুতোটার অন্য প্রান্ত থেকে ছিপে খ্যাঁচ মেরে মাছ বেঁধানোর মতো হ্যাঁচকা টান মেরেছিল। মানুষ মারার বিদঘুটে ফন্দি বটে ! এমনি করেই তাহলে বাবু বংকারামকে দম আটকে খুন করা হয়েছিল।

সুতোটা প্রায় দশ-বারো মিটার লম্বা। ল্যাসোর এক খুদে সংস্করণ আর কি ! গুটিয়ে পকেটে রাখলুম, কর্নেলের জাদুঘরে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে উপহার দেব এটা। সঙ্গে একটা চিরকুটে লেখা থাকবে : এই নিরীহ সুতোটি প্রখ্যাত সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীকে যমের বাড়ির দরজা অব্দি টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "এই সেই ময়নাচোর স্কুইরেল মাংকি, ডার্লিং ! হালদারমশাইয়ের সাধু, পাখি, আর বাঁদরের মধ্যে বাঁদরটা হাতে এল। বাকি রইল পাখি আর সাধু। একটুর জন্য সাধু ফসকে গেছে। তবে আশা করি, আবার তার দেখা আমরা শিগগির পাব। শুধু পাখিটার জন্য ভাবনা হচ্ছে।"

বললুম, "আমার আর এক সেকেণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না কর্নেল। তাছাড়া শ্বাসনলিতে ব্যথা করছে।"

কর্নেল বললেন, "ঠিক আছে। চলো, ফেরা যাক। পরে আবার এসে বাবু বংকারামের ডেরা খোঁজা যাবে।" তারপর খুদে প্রাণীটাকে জ্যাকেটের ভেতরকার পকেটে ঢুকিয়ে বোতাম আঁটলেন। বাঁদরটা নড়ল না একটুও।

গ্রামের রাস্তায় ফিরে যাবার সময় একটা ভিড় চোখে পড়ল। একটা কুঁড়েঘরের সামনে পুরুষ, স্ত্রীলোক, কাচ্চাবাচ্চা ভিড় করে কী যেন দেখছে। উঁকি মেরে দেখি, একটা কালো মরা পাখি পড়ে আছে মাটিতে। সেটাই সবাই ভিড় করে দেখছে। কর্নেলের দিকে তাকালুম। খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন গোয়েন্দাপ্রবর। একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, মরা পাখি দেখার জন্য এত ভিড় কেন ?"

সে বলল, "সায়েব, এটা একটা ময়নাপাখি।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। পাখিটা মরল কী করে ?"

একজন বুড়ো বলল, "হুজুর, পাখিটা আমার নাতনি কুড়িয়ে পেয়েছে মাঠে। তখনও ধুঁকছিল। এনে মুখে জল দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করল। বাঁচল না। এ পাখিটা আমরা চিনতে পেরেছি। সেজন্য এই ভিড়।"

"পাখিটা কার ?"

"বাবু গঙ্গারাম দাস বলে একটা লোক ছিল, এ তারই পাখি। পাখিটা ভাল বুলি বলতে পারত, হুজুর ! ওড়িয়া, হিন্দি আবার ইংরিজিতেও নাকি বুলি বলত। বাবু গঙ্গারাম দাস ছিল লেখাপড়া-জানা লোক। বড্ড খেয়ালি আর দিলদরিয়া ছিল তার মেজাজ। গরিব লোকদের প্রতি খুব দয়া ছিল তার।"

আমি চমকে উঠেছিলুম। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি এখন কোথায় আছেন ?"

বুড়ো বলল, "জানি না হুজুর ! বাবু গঙ্গারাম থাকত বাবু বংকারামের বাড়িতে। শুনেছি ওরা নাকি ছিল মাসতুতো ভাই। বছরখানেক আগে বাবু বংকারাম জঙ্গলে ঝরনার ধারে খুন হয়েছে। বাবু গঙ্গারাম তারপর থেকে নিপাত্তা। পুলিশ তাকে আর গোপেশ্বর নামে একটা লোককে খুনি বলে সন্দেহ করেছিল বটে, কিন্তু আমরা এ কথা বিশ্বাস করি না, অমন নিরীহ আর দয়ালু লোক গঙ্গারাম মানুষ খুন করতে পারে। খুনোখুনির কাজ গোপেশ্বর পারত বটে। সেও ছিল এক সাংঘাতিক ডাকাত। বাবু বংকারামের স্যাঙাত।"

কর্নেল পাখিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ পাখি যে বাবু গঙ্গারামের, তোমরা চিনলে কেমন করে ?"

সবাই হইচই করে উঠল জবাব দেওয়ার জন্য। সবাইকে থামিয়ে বুড়ো বলল, "ওই যে দেখছেন পাখিটার একটা পায়ে রুপোর আংটা। বাবু গঙ্গারাম সবসময় পাখিটাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ওই আংটার সঙ্গে ছিল সরু চেন। চেনটা থাকত বাবু গঙ্গারামের গলায় জড়ানো। মনে হচ্ছে, আংটা থেকে চেন ছিঁড়ে কী ভাবে পাখিটা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এতদিন।"

কর্নেল হাঁটু ভাঁজ করে ঝুঁকে পাখিটাকে ভাল করে দেখতে গেছেন, অমনি তাঁর জ্যাকেটের ভেতর থেকে দুটো বোতামের মাঝখান দিয়ে বজ্জাত খুদে বাঁদরটা সুড়ুত করে পিছলে পড়ল। তারপর লোকগুলোর পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে চোখের পলকে কুঁড়েঘরের চালে চড়ে বসল। এবার তাজ্জব হয়ে দেখলুম, বাঁদরটা মরা পাখিটাকে হাতিয়ে নিয়েছে।

সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। কর্নেলও হতভম্ব। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। আমিও তাই। তারপর লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠল, "ভুণ্ডুরাম ! ভুণ্ডুরাম !"

চ্যাঁচামেচিতে হয়তো ভয় পেয়েই বাঁদরটা পাখিটা নিয়ে এক লাফে কুঁড়েঘরের পেছনের দিকে উধাও হয়ে গেল। ওর গতি আর ভঙ্গি অবিকল কাঠবেড়ালির মতো। কর্নেল বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে বললেন, "পাকড়ো। পাকড়ো ! বখশিশ মিলেগা !"

বখশিশের লোভে হইচই করতে করতে অনেকে ছুটে গেল। বুড়ো কর্নেলকে আশ্বস্ত করে বলল, "চুপ করে বসে থাকুন হুজুর ! খাটিয়া এনে দিচ্ছি। ভুণ্ডুরামকে ওরা এক্ষুনি ধরে ফেলবে। ওটা তো একটা পোষা বাঁদর।"

সে ঘর থেকে দুটো খাটিয়া এনে দিল। আমরা বসলুম। তারপর কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, "বাঁদরটাও তোমাদের চেনা দেখছি !"

বুড়ো হাসতে হাসতে বলল, "হুজুর কি ভুণ্ডুরামকে কিনে আনলেন ভগিয়ার কাছ থেকে ?"

কর্নেল বললেন, "বাঁদরটা আমি ভগিয়ার কাছে কিনিনি। অন্য একজনের কাছে কিনেছি।"

বুড়ো অবাক হয়ে বলল, "সে কী ! ভগিয়া ভুণ্ডুরামকে তাহলে বেচে দিয়েছিল। কার কাছে বলুন তো হুজুর ?"

কর্নেল বললেন, "নাম জানি না। বাবু বংকারামের বাড়ির ওখানে একটা লোক—"

বুড়ো কথা কেড়ে বলল, "বুঝেছি। বেঁটেমতো, মাথায় টাক আছে তো ? নব।"

"ভগিয়া কে ?"

"নবর ভাই। ভগিয়া যে সারাদিন ভুণ্ডুরামকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত। তাই নব বলত বটে, বাঁদরটাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসবে, নয়তো কাউকে বেচে দেবে।"

"ভগিয়া এমন জাতের বাঁদর পেল কোথায় ?"

"জঙ্গল থেকে নাকি ধরে এনেছিল। খেলা শিখিয়েছিল। যা বলত, তাই শুনত ভুণ্ডুরাম।"

"ভগিয়াকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে ?"

"বলা কঠিন। শুনেছি, সে নাকি এক সাধুবাবার চেলা হয়েছে। কোথায়-কোথায় ঘোরে সাধুবাবার সঙ্গে।"

"এক সাধুবাবা নাকি অদৃশ্য হতে পারেন—তাঁরই চেলা হয়নি তো ভগিয়া ?"

বুড়ো মুখ বেঁকিয়ে বলল, "সে সাধুবাবা স্বয়ং শিব। ভগিয়া তার চেলা হবে? তাহলে পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠবে না? হুজুর, ভগিয়ার সাধুবাবা আর কেমন হবে? ভগিয়ার মতোই হবে। কেউ কেউ বলে, সাধুটা নাকি গোপেশ্বর। পুলিশের ভয়ে সাধু সেজে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।"

লোকগুলো হইচই করে ফিরে এল। ফাঁসুড়ে ভুণ্ডুরামকে ধরে এনেছে ওরা। মরা পাখিটাকে এখনও বজ্জাতটা আঁকড়ে ধরে রয়েছে। কর্নেল বাঁদরটাকে আগের মতোই জ্যাকেটের ভেতর পকেটে চালান করলেন এবং একটা হাত চেপে রাখলেন, যাতে আর না পালাতে পারে। মরা পাখিটাকে আমি রুমালে জড়িয়ে নিলুম কর্নেলের আদেশে।

ওদের বখশিশ দিয়ে বুড়োর কাছে বিদায় নিয়ে কর্নেল হঠাৎ আমাকে চাপা গলায় ইংরেজিতে বললেন, "জয়ন্ত, দূরে একটা লোককে দৌড়ে আসতে দেখছি। মনে হচ্ছে, লোকটা ভগিয়ার দাদা নব। ওই দ্যাখো, সামনে বড় রাস্তার মোড়ে একটা অটোরিকশো দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৌড়নোর জন্য তৈরি হও। ওয়ান, টু, থ্রি—রান!"

পেছনের লোকগুলো নিশ্চয় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে আছে। জীবনে এমন দৌড় কখনও দৌড়ইনি, কিংবা পঁয়ষট্টি বছরের খ্রিসমাস সাণ্টা ক্লজ চেহারার এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককেও দৌড়তে দেখিনি।

অটোরিকশোয় চেপেই কর্নেল বললেন, "ডবল ভাড়া সর্দারজি! তুরন্ত চলিয়ে ইধার টাউনশিপ হোকে সিধা।"

ড্রাইভার কী বুঝল কে জানে, তক্ষুনি স্টার্ট দিয়ে বাহনটাকে রকেটের বেগে ছুটিয়ে দিল পার্বতী নদীর ব্রিজের দিকে। ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে সে মুচকি হেসে বলল, "ইধার গোপেশ্বর ডাকু রহতা হ্যায়! কভি ইধার মাত আইয়ে জি।"

প্রদীপবাবুর বাংলোবাড়িতে পৌঁছে দেখি, সবে ডঃ সীতাকান্ত পটনায়ক ভুবনেশ্বর থেকে নিজেই জিপ চালিয়ে হাজির। কর্নেল পকেট থেকে ভুণ্ডুরামকে বের করলে উনি চমকে গিয়ে বললেন, "স্কুইরেল মাংকি মনে হচ্ছে? কোথায় পেলেন?"

কর্নেল হালদারমশাইয়ের প্রসঙ্গ থেকে শুরু করলেন। কথা শেষ হলে ডঃ পটনায়ক বললেন, "কী আশ্চর্য! কাল দুপুরে কলকাতার ফরেনসিক ল্যাবরেটরি হলে যখন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তখন যদি গঙ্গারামের ব্যাপারটাও বলতেন, তখনই সব জানিয়ে দিতুম আপনাকে।"

কর্নেল বললেন, "চেনেন নাকি গঙ্গারামকে?"

"ভীষণ চিনি," ডঃ পটনায়ক উত্তেজিতভাবে বললেন। "ভদ্রলোক ছিলেন বাঙ্গালোর স্পেস রিসার্চ সেন্টারের জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানী। খুব খেয়ালি স্বভাবের মানুষ। হঠাৎ চাকরি ছেড়ে নিখোঁজ হয়ে যান। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ওল্ড কোদণ্ডগিরিতে বাবু বংকারামের বাড়িতে এসে জুটেছিলেন।"

"বাবু বংকারামের নাকি মাসতুতো ভাই উনি।"

"হতে পারে," ডঃ পটনায়ক বললেন। "কেন এখানে এসেছিলেন, তাও আঁচ করতে পারছি। জঙ্গলের ভেতর কোদণ্ডগিরি পাহাড়ে নিশ্চয় গোপনে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা করছিলেন। একটু আগে মিঃ রায়ের কাছে যা শুনলুম তাতে ওঁর সাফল্যের প্রমাণও পেয়েছি। এমন একটা রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি।"

ডবল P মানে P
ডবল পাওয়ার

National নিপ্পো

স্পেশাল ব্যাটারি

যখন অন্যান্য ব্যাটারি লিক করতে ও শেষ হতে সুরু করে, তখন নিপ্পো স্পেশাল বিনা বিরতিতে চালু থাকে।

অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারদের তদারকিতে শ্রেষ্ঠ মানের কাঁচা উপাদানে নিপ্পো প্রস্তুত করা হয়। গত ১১ বছর ধরে ক্রেতাদের পছন্দের তালিকায় সেরা জিনিসটি এখন তার ১০০ কোটিতম সেল উৎপাদনের উৎসব পালন করছে।

এ ছাড়া রয়েছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

- টপ সীল, কারখানা-তাজা শক্তির গ্যারান্টি দেয়।
- ISI মার্কা—গুণমান সম্পর্কে আপনার ভরসা।
- জাপানের ন্যাশনাল থেকে বিশ্ব-শ্রেণীর প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রস্তুত।
- আপনার কাছে পৌঁছবার আগে প্রতিটি ব্যাটারি-ইলেক্‌ট্রনিক উপায়ে পরীক্ষিত।

everest/d85/INL/83 ben

"হ্যাঁ। রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা সত্যি বিস্ময়কর।"

"কিন্তু এসব কাজের জন্য প্রচুর টাকা দরকার। এত টাকা কোথায় পেলেন জি আর ডি ?" ডঃ পটনায়ক একটু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, —ডঃ গঙ্গারাম দাস জি আর ডি নামেই বিজ্ঞানীমহলে পরিচিত ছিলেন।"

কর্নেল বাঁদরটার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "তাহলে কি বাবু বংকারামকে ডাকাতি করে টাকা যোগাড় করার জন্য উনিই প্ররোচিত করেছিলেন ? হয়তো বাবু বংকারামকে কোনও লোভ দেখিয়েছিলেন।"

প্রদীপবাবু এসে বললেন, "লাঞ্চ রেডি। দেড়টা বাজতে চলল। এবার দয়া করে উঠে পড়ুন।"

॥ ছয় ॥

খাওয়াদাওয়ার পর মরা ময়নাপাখিটা নিয়ে কর্নেল এবং ডঃ পটনায়ক কী সব পরীক্ষায় বসলেন। ডঃ পটনায়কের সঙ্গে সবসময় একটা খুদে পোর্টেবল ল্যাবরেটরি থাকে। দেখতে সেটা একটা প্রকাণ্ড স্যুটকেসের মতো। টেবিলে সেটা খুলে বসেছেন।

ফাঁসুড়ে ভুশুরাম এখন প্রদীপবাবুর জিম্মায়। ওকে বন্য প্রাণী গবেষণাগারের হেফাজতে দেওয়া হবে। রাত জেগে ট্রেন জার্নি, তার ওপর যমের দুয়ার থেকে ফেরার ধাক্কায় আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। শ্বাসনলির ব্যথাটা গরম জলের গার্গলে অনেকটা কমেছে। সবে চোখ বুজে আসছে ভাতঘুমে, এমন সময় কর্নেল এবং ডঃ পটনায়কের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গেল। কর্নেল বললেন, "কী আশ্চর্য ! এ যে দেখছি একটা নকশা !"

ডঃ পটনায়ক বললেন, "হ্যাঁ, —ব্লুপ্রিন্ট বলতে পারেন। নিশ্চয় গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্লুপ্রিন্ট। তা না হলে পাখির পায়ে রুপোর আংটার মধ্যে রোল করে লুকিয়ে রাখা হবে কেন ? এটা কিন্তু সাধারণ কাগজ নয়। গুপ্তচররা ব্যবহার করে এগুলো। এক বর্গফুট কাগজও রোল করে নখের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। এবার বোঝা গেল, পাখিটা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ফাঁদে আটকে আদিবাসী ছেলেরা ওকে ধরে। হালদারমশাই কিনে নিয়ে যান। তাঁর বাড়ি থেকে পাখিটা উদ্ধার করে আনার সময় আবার হাত ফশকে পালিয়েছিল। পালাতে গিয়ে বিদ্যুতের শক খেয়ে শেষে মারা পড়ে।"

কর্নেল বললেন, "মাঠে পড়েছিল নাকি পাখিটা। ওখানে বিদ্যুতের তার গেছে দেখছি।"

"ডি সি বিদ্যুতের শকে ছিটকে পড়াই সম্ভব। এ সি হলে তারে আটকে থাকত।"

"বুঝেছি। হালদারমশাইয়ের সঙ্গে সাধু আর তার চেলা যখন ধস্তাধস্তি করছিল, তখনই পাখিটা পালিয়ে থাকবে।"

"হালদারমশাইয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ?" কর্নেল হাসলেন। "বেনামী চিঠিতে বলা হয়েছে, ওঁকে ওরা আটকে রেখেছে। তার মানে ধস্তাধস্তিটা খুব সাংঘাতিকই হয়েছে। হালদারমশাই তো সহজে বন্দী হবার পাত্র নন। ওঁকে কায়দা করতে পাখির হাত ফসকে পালানো স্বাভাবিকই।"

ডঃ পটনায়ক আবার নকশাটার ওপর আতশকাচ নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, "কর্নেল, আমার মনে হচ্ছে, এটা কোদণ্ডগিরি পাহাড়ে জি আর ডির ল্যাবরেটরি এবং স্পেস রিসার্চ সেন্টারের ব্লুপ্রিন্ট। ওই গোপন জায়গায় যাবার হদিসও এতে আছে যেন। এই চিরুনির মতো চিহ্নটা দেখুন। এটা সম্ভবত ঝরনা। আর তার উলটোদিকে এই লাল ফুটকিটা কি সেই লাল রঙের প্রকাণ্ড পাথরটাই—যেটা আমি দেখে গিয়েছিলুম জানুয়ারিতে এসে ?"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "এখনই বেরিয়ে পড়া যাক। আড়াইটে বাজতে চলল। দিনের আলো থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়াই ভাল। জয়ন্ত, তুমি যাবে নাকি ?"

তড়াক করে উঠে বসলুম। বললুম, "যাব না মানে ? দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার লক্ষ-লক্ষ পাঠক হাপিত্যেশ করে বসে আছে না ?"

ডঃ পটনায়ক বললেন, "হাঁটা-পথেই যাব। অবশ্য পথ বলা ভুল। জানুয়ারিতে এসে কোদণ্ডগিরি পৌঁছতে খুব হন্যে হয়েছিলুম। একবার হাতির পালের সামনে, আর একবার চিতাবাঘের সামনেও পড়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের এক বিশেষজ্ঞ। তিনি তো আতঙ্কে মারা পড়ার দাখিল।"

প্রদীপবাবু এসে ওঁর কথা কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন, "জানুয়ারিতে এসেছিলেন আপনারা ? জঙ্গলে বেড়াতে নাকি ?"

"না মিঃ রায়। নিছক বেড়াতে এলে তো আপনি জানতে পারতেন। আপনার শরণাপন্ন না হয়ে উপায় ছিল না। আমরা এসেছিলুম একটা সরকারি তদন্তে। কোদণ্ডগিরি পাহাড়ে নাকি অদ্ভুত সব আলো দেখা যায়। আগুনের গোলাও দেখা যায়। আমার ধারণা ছিল, ওখানে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস আছে ভূগর্ভে। কিন্তু এসে কিছুই হদিস করতে পারিনি । আর পাহাড়টায় চড়াও একেবারে অসম্ভব। পুরোটা গ্রানাইট শিলায় তৈরি। যাই হাক, ফেরার পথে পার্বতী নদীর ধারে বালির চড়ায় ওই রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।"

প্রদীপবাবু বললেন, "আগুনের গোলার কথা আমিও শুনেছিলুম।"

কর্নেল বললেন, "আজ সকালে দেখতেও পেলেন।"

প্রদীপবাবু চমকে উঠে বললেন, "কিন্তু ওটা তো আগুনের গোলা নয়। ছাই-রঙের একটা গোলক।"

"রাতে ওটা থেকে রশ্মি ঠিকরে পড়ে। তাছাড়া মহাকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহ রাতের আকাশে আগুনের গোলার মতো দেখাতে পারে।"

প্রদীপবাবুও আমাদের সঙ্গ ধরলেন। এতে খুশিই হলেন কর্নেল এবং ডঃ পটনায়ক। প্রদীপবাবু কোদণ্ডগিরি জঙ্গলের নাড়িনক্ষত্র জানেন। রাস্তা ভুল হবার চান্স থাকবে না।

পাহাড়ি জঙ্গলের সৌন্দর্য তুলনাহীন । তাছাড়া এখন বসন্তকাল। কত রকম ফুল ফুটেছে চারদিকে। মিঠে গন্ধে মউ-মউ করছে বনপথ। পাখপাখালি গান ধরেছে মনের সুখে। কিন্তু এসব দিকে আমাদের কারুর মন নেই। প্রদীপবাবু সতর্কতার জন্য একটা শটগান হাতে নিয়েছেন। বুনো জন্তুর পাল্লায় পড়লে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যই। এ জঙ্গলে পশুপাখি হত্যা নিষিদ্ধ।

একবার হাতির চিৎকার কানে এল। প্রদীপবাবু বললেন, "পার্বতী নদীতে দিনের শেষে খেলতে নেমেছে হাতির পাল। বাতাস ওদিক থেকে বইছে। কাজেই আমাদের গন্ধ পাবে না

ওরা।" একখানে টিলার ওপর মহুয়া গাছে ভালুক দেখিয়ে দিলেন। বহু দূরে একবার যেন বাঘের গর্জনও শুনলুম।

পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব পেরুতে ঘন্টা-দেড়েক লেগে গেল। এর কারণ রাস্তা বেশ দুর্গমই। চড়াই উতরাই বিস্তর। ঝরনা এড়িয়ে আমরা কোদণ্ডগিরির পশ্চিমে গিয়ে দাঁড়ালুম। পাহাড়টা অন্তত হাজার-দশেক ফুট উঁচু। দূর থেকে শর লাগানো ধনুক বা পিরামিডের মতো মনে হয় বটে, কাছ থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু মিনারের মতো খাড়া ছুঁচলো চূড়াটা চোখে পড়ছিল। পাহাড়ের নীচে বিশাল-বিশাল পাথর পড়ে আছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে পাথর আর ঝোপ। তারপর উঁচু গাছের জঙ্গল। তাই এখানে বিকেলের গোলাপি রোদ ছড়িয়ে আছে।

কর্নেল ও ডঃ পটনায়ক সেই নকশা আঁকা চিরকুট খুলে পরামর্শ করছিলেন। হঠাৎ কর্নেল বললেন, "লাল ফুটকি ? হুঁ, দেখুন তো ডঃ পটনায়ক ! ওই লাল পাথরটাই তো ?"

ডঃ পটনায়ক বললেন, "হ্যাঁ, —ওটাই। চলুন, দেখা যাক।"

কর্নেল বলেন, "সাবধান ! সবাই গুঁড়ি মেরে পাথরের আড়ালে-আড়ালে এগিয়ে চলুন।"

লাল পাথরটার কাছে পৌঁছে আবার দু'জনে নকশা দেখে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় পরামর্শ করলেন। তারপর কর্নেল বললেন, "সবাই হাত লাগান। দেখা যাক, পাথরটা সরানো যায় নাকি।"

লালপাথরটা কিন্তু তত ওজনদার নয়। একটু ঠেলতেই সরে গেল। যত সরল ওটা, তত নীচের দিকে একটা গর্ত দেখা যেতে থাকল। কর্নেল বললেন, "এই তো দেখছি সুড়ঙ্গের মুখ।একে একে নামা যাক। টর্চ জ্বালতে হবে মনে হচ্ছে।"

প্রথমে কর্নেল, তারপর ডঃ পটনায়ক, তারপর আমি, শেষে প্রদীপবাবু গর্তে নামলুম। ধাপে ধাপে সিঁড়ি একটু নেমে যাওয়ার পর ওপরের দিকে উঠে গেছে। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ টের পাচ্ছি। টর্চের আলোয় কালো পাথরের ধাপ ক্রমশ উঠছে তো উঠছে। আমরাও উঠছি। অনেকখানি ওঠার পর কিছুটা করিডোরের মতো সমতল জায়গা। অবাক হয়ে লক্ষ করলুম, সামনে আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে। কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবার পা বাড়ালেন। করিডোরের মতো জায়গাটা প্রায় দু'মিটার চওড়া। আলোটা আসছে বাঁদিক থেকে। করিডোর বেঁকে গিয়ে আবার সিঁড়ির মুখে শেষ হয়েছে। সিঁড়ির মাথায় হলুদ একবিন্দু আলো। ঠিক আলো নয়। অদ্ভুত একটা রশ্মি যেন। কর্নেল ধাপে পা রেখেছেন, অমনি গমগমে গলায় কেউ বলে উঠল, "সাবধান গোপেশ্বর ! আর এক পা এগোবার চেষ্টা কোরো না। বুঝতে পেরেছি, তুমি এতদিনে আমার ল্যাবরেটরিতে ঢোকার নকশা পেয়েছ। আমার দুর্ভাগ্য গোপেশ্বর পাখিটা শয়তান বংকারাম চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিল। তাছাড়া আমার আর সি এস যন্ত্রটাও চুরি করেছিল ডাকাত হতচ্ছাড়া। ওকে খুন করে তুমি সব হাতিয়েছ আমি জানতুম। কাল দুপুরে এবং আজ সকালে আমার স্পেসশিপ দু-দুবার ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি জানি, তুমি আর সি এস তো হাতিয়েছ। উপরন্তু ওটা ব্যবহার করার কৌশলও জেনে গেছ। শোনো গোপেশ্বর, আমি তোমাকে ঢুকতে দেব একটা শর্তে।"

কর্নেল বলে উঠলেন, "বলো গঙ্গারাম !"

"তোমার বাঁ দিকে একটা ঘুলঘুলি দেখতে পাচ্ছ ?"

"পাচ্ছি।"

"নকশা আর আর সি এস যন্ত্রটা ওখান দিয়ে ঢুকিয়ে দাও।"

"তাহলে ঢুকতে দেবে তো গঙ্গারাম ?"

"দেব।"

দেখলুম ডঃ পটনায়ক কর্নেলকে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কর্নেল গ্রাহ্য করলেন না ওঁকে। নকশা আর সেই রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র ঘুলঘুলির ভেতর ফেলে দিলেন। অমনি হা-হা হাসির শব্দ এসে আমাদের কানে ধাক্কা দিল। হলদে আলোর ফুটকিটা নিবে গেল। নেপথ্য থেকে নিষ্ঠুর কথা গমগম করে ভেসে এল," গোপেশ্বর, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।"

কর্নেল চিৎকার করে বললেন, "ডঃ দাস, আমি গোপেশ্বর নই। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ! আমার সঙ্গে আছেন আপনার পুরনো বন্ধু ডঃ সীতাকান্ত পটনায়ক, সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী এবং এই জঙ্গলের কনজারভেটর প্রদীপ রায়। আপনি আগে দেখুন, আমরা কারা। তারপর শাস্তি দেবেন।"

ডঃ পটনায়কও জোরে চেঁচিয়ে বললেন, "জি আর ডি। আমি পটনায়ক।"

অন্তত এক মিনিট পরে কথা ভেসে এল, "গোপেশ্বর কোথায় ?"

"আমরা জানি না ডঃ দাস," কর্নেল বললেন। "দয়া করে আমাদের ঢুকতে দিন। সব বলব।"

"আপনারা আসুন।"

আবার হলুদ আলোর ফুটকি দেখতে পেলুম। সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠতে থাকলুম। শেষ ধাপের পর আবার একটা করিডোর। বাঁ দিকে একটা কালো দরজা খুলে গেল। একে একে ভেতরে ঢুকলুম। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিশাল এক ল্যাবরেটরি। একপাশে রকেটের মতো দেখতে একটা প্রকাণ্ড সাদা চোঙা ছাদ ফুঁড়ে চলে গেছে। সেখানে রেলিং ঘেরা। অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে নানারকম। শোঁ শোঁ...ব্লপ্‌ব্লিপ্...কিটকিট...বিচিত্র সব শব্দ। কিন্তু কোনও লোক দেখতে পাচ্ছি না।

ডঃ পটনায়ক বললেন, "জি আর ডি, কোথায় তুমি ?"

অমনি সামনে একটু তাকাতে চোখ-ধাঁধানো নীল আলো খেলে গেল এক সেকেণ্ডের জন্য। তারপর দেখি, সেখানে লম্বা রোগা ফর্সা, একমাথা সাদা চুল, গেরুয়া আলখাল্লার মতো পোশাক পরা এক সৌম্য চেহারার প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে মিটিমিটি হাসি। "কী পটনায়ক, অলৌকিক কীর্তি ভাবছ নাকি ? তোমাকে বলেছিলুম পটনায়ক, যে-কোনও পদার্থকে ভরহীন ফোটনে পরিণত করা যায় এবং তা চর্মচক্ষে অদৃশ্য মনে হবে। তুমি বলেছিলে, ফোটনে পরিণত হলে তা আলোর সমান গতিবেগ পাবে এবং তাই বিশ্বজগতে ছড়িয়ে পড়বে। ঠিক, ঠিক। কিন্তু লেসার রশ্মি দিয়ে ফ্রেমের মতো ঘিরে রাখতে পারলে তা ছড়াবে না এবং ফোটনগুলোকে আবার আগের মতো ভরযুক্ত পদার্থ-কণিকায় রূপান্তরিত করা যাবে। এখন স্বচক্ষে দেখলে তো পটনায়ক, সেই অসম্ভব আমি সম্ভব

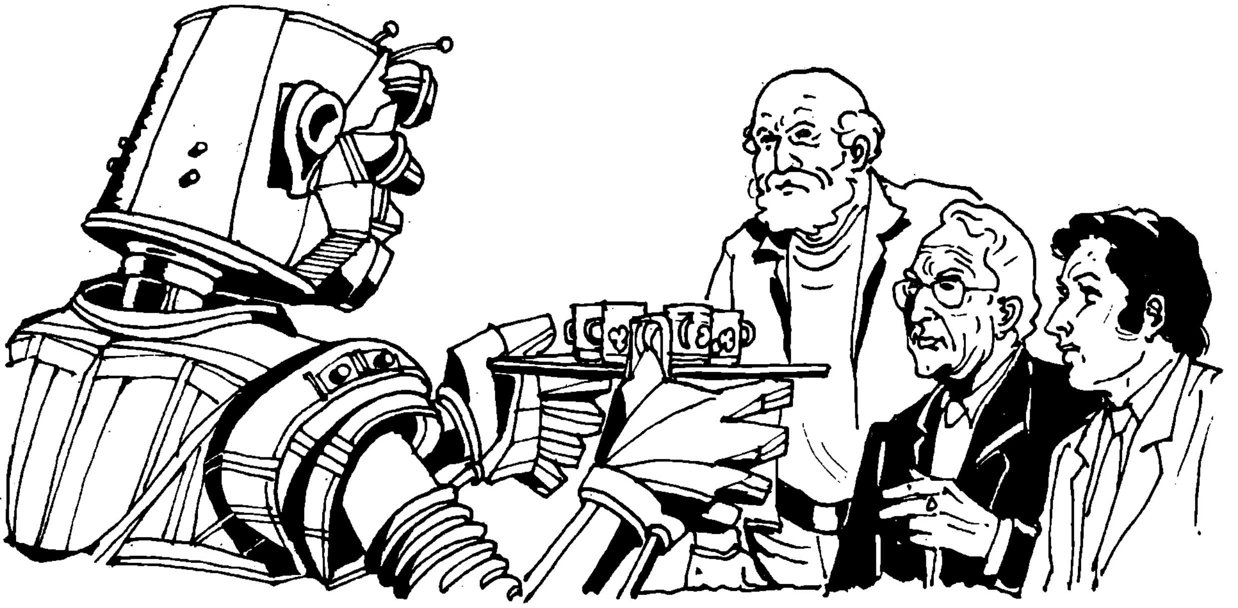

করেছি ?"

"দেখলুম ভাই ! তোমার কোনও তুলনা হয় না।"

বিজ্ঞানী গঙ্গারাম দাস কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "একসময় খবরের কাগজ পড়তুম। তখন আপনার অনেক কীর্তিকলাপ কাগজে পড়েছি। বসুন, বসুন। আপনারা আমার সম্মানিত অতিথি।"

আমরা বসলুম। ডঃ দাস বিশাল টেবিলের ওধারে বসলেন। তারপর বোতাম টিপলেন। তক্ষুনি খটখট শব্দে একটা ছোট্ট মানুষের গড়নের রোবট এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ডঃ দাস বললেন, "চা কফি কোল্ড ড্রিংক্স—যা খেতে চান, সেই বোতাম টিপুন। পেয়ে যাবেন।"

কর্নেল কফির বোতাম টিপলেন। খট করে একটা কাগুজে পেয়ালা পড়ল রোবটের পেটের নীচের খোঁদলে। তারপর গড়গড় করে কফি বেরিয়ে পেয়ালা ভর্তি হয়ে গেল।

আমরা সবাই কফিই নিলুম। তারপর রোবটটা চলে গেল। ডঃ পটনায়ক বললেন, "পাহাড় কেটে এই ল্যাবরেটরি বানিয়েছ দেখে অবাক লাগছে জি আর ডি ! এ যে দৈত্যের কীর্তি ! কী করে বানালে ?"

জি আর ডি বললেন, "আমি তো বানাইনি, ভাই। এটা বংকারামের পূর্বপুরুষের তৈরি গোপন দুর্গ। এটার জন্যই ওর সঙ্গে ভাব করেছিলুম। ওকে মিথ্যা লোভ দেখিয়েছিলুম, দুর্গের ভেতর ওর পূর্বপুরুষের গুপ্তধন আছে। উদ্ধার করে দেব। কিন্তু ও চিরকালের বজ্জাত। যখন বুঝল আমি ল্যাবরেটরি বানাচ্ছি, তখন থেকে বদমাইসি শুরু করল। গোপেশ্বর নামে ওর এক ডাকাত-স্যাঙাত আছে। তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করল শয়তানটা। যাকগে, গোপেশ্বর ওকে খুন করেছে। তবু আর সি এস এবং নকশাটা হাতাতে পারেনি।"

কর্নেল সংক্ষেপে আগাগোড়া সব ঘটনা বললেন। ডঃ পটনায়ক আর সি যন্ত্রটা কোথায় পেয়েছিলেন, তাও বললেন। ডঃ দাস খুব হাসতে লাগলেন শুনে। শেষে গম্ভীর হয়ে বললেন, "কিন্তু মিঃ রায়ের মামা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে। গোপেশ্বর ডাকু সাংঘাতিক লোক। ওকে কিছু বিশ্বাস নেই। তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, ঝরনার ধারে রাত দশটায় ব্যাটা আসবে বলেছে তো ? তখনই আমি ওকে ধরতে রোবট পাঠিয়ে দেব। রোবটের টিপুনি খেয়ে সে কবুল করবে মিঃ হালদারকে কোথায় আটকে রেখেছে। তারপর ব্যাটাকে পুলিশের কাছে জিম্মা দেবেন মিঃ রায়।"

কর্নেল বললেন, "একটা কথা ডঃ দাস। পাখিটাকে অমন কথা কেন শিখিয়েছিলেন ?"

বিজ্ঞানী মুচকি হেসে বললেন, "বংকারাম যদি আমাকে সত্যি খুন করে, তাহলে অন্তত পাখিটা সাক্ষি দিতে পারবে, এই ভেবেই। ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলুম না যে।"

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এবং ল্যাবরেটরি দেখে আমরা বিদায় নিলুম। এবার আমাদের উলটো দিকে ঝরনার ধারের গোপন দরজা খুলে বের করে দিলেন ডঃ দাস। তারপর আমাদের চমকে দেবার জন্য আবার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, বুঝলুম হালদারমশাই তাহলে ঠিকই দেখেছিলেন।

বাংলোয় ফিরে আমরা আবার অবাক। হালদারমশাই জলজ্যান্ত বসে রয়েছেন। শুধু মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ। বললেন, "আমার নাম কে কে হালদার। আমাকে আটকে রাখবে ওই পুঁচকে দুটো লোক ? রেলইয়ার্ডে সাধু আর তার চেলাকে ফলো করছিলুম। হঠাৎ ওরা মালগাড়ির আড়ালে লুকিয়ে গেল। আসলে ওত পেতে বসেছিল, বুঝলেন ? যেই গেছি, লাফিয়ে পড়েছে। শেষে মাথায় ডাণ্ডার বাড়ি। জ্ঞান হলে দেখি, মালগাড়ির ওয়াগনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি। গায়ে জোর আসতে দেরি হচ্ছিল, তাই। নইলে কখন বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসতুম। যাক গে, এবার আপনাদের খবর বলুন, কর্নেলস্যার ?" হালদারমশাই মাথার ব্যাণ্ডেজে হাত বুলোতে থাকলেন।

কর্নেল বললেন, "আপাতত খবর হল, আজ রাত দশটায় আপনার সেই সাধু ওরফে গোপেশ্বর আর তার চেলা ভগিয়া ঝরনার ধারে রোবটের হাতে বন্দী হবে।"

হালদারমশাই বললেন, "রোবট ? যাঃ !" খি-খি করে বেজায় হাসতে লাগলেন গোয়েন্দা কৃতান্ত হালদার।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

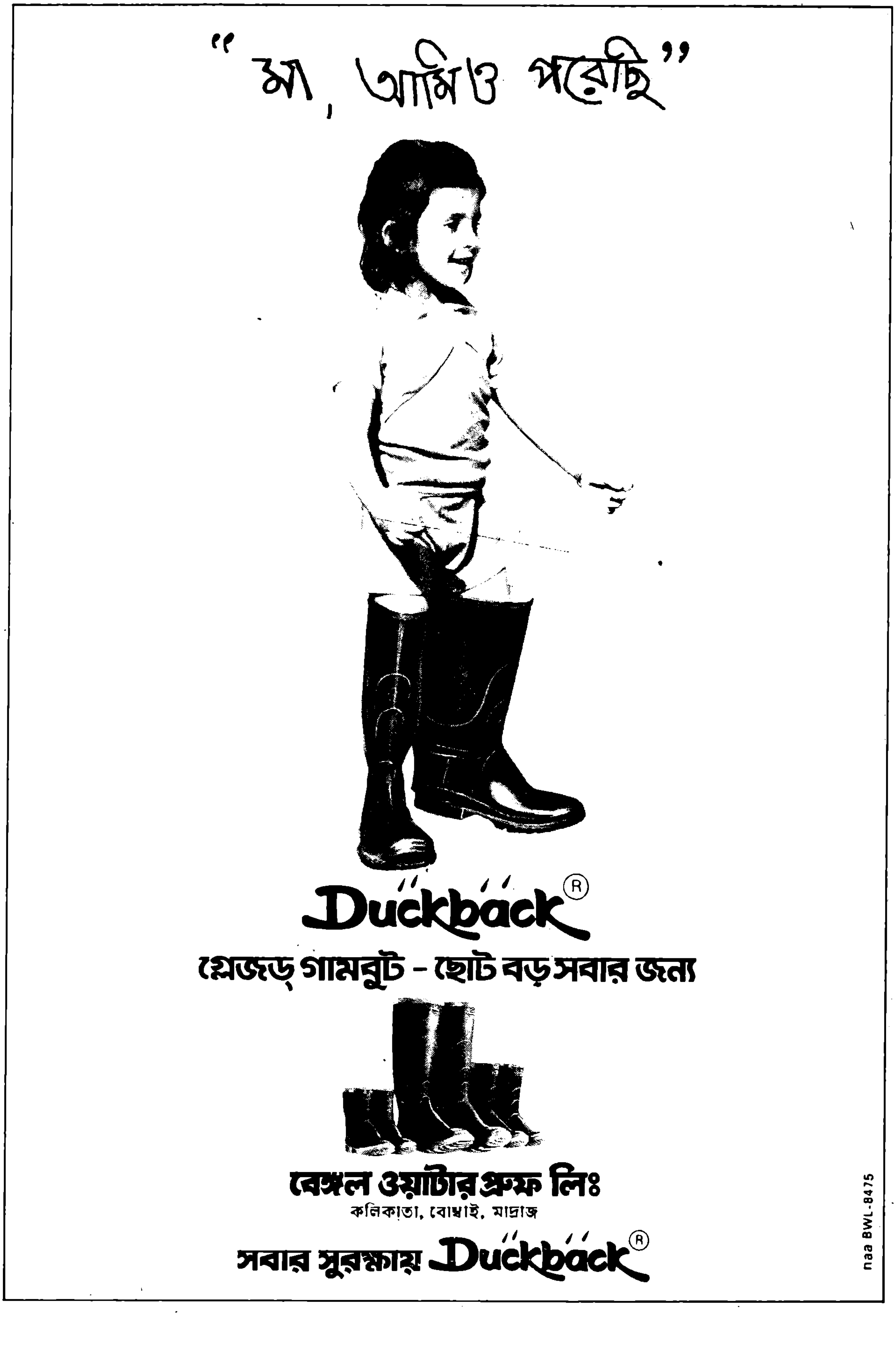
"মা, আমিও পরেছি"
Duckback®
গ্লেজড্ গামবুট - ছোট বড় সবার জন্য
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিঃ
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ
সবার সুরক্ষায় Duckback®
naa BWL-8475

সহজে ইংরেজি

সে-দিন ভোরবেলা

তখনও ভাল করে ভোরের আলো ফোটেনি। বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চম্বলের বন্ধু মণি ডাকাডাকি শুরু করেছে।

"Chambal! I say, Chambal! Get up, will you?"
Chambal was fast asleep, but his mother woke up at the noise.
"What's this?" she thought. "It sounds like Mani."
She looked out of the window, and there he was, shouting at the top of his voice.
"What is it, Mani? What's the matter? Do you want to wake up the whole street?" asked Mrs. Roy.
"Good morning, Auntie." Mani said, "Chambal and I are going for a walk."
"A walk? At this hour? What has got into you?"
"They say it's good for health. Is Chambal stirring? It's getting late."

চম্বল চোখ মুছতে মুছতে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

"Shall we go now?" he said, and they set off. Mr. Roy, too had got up by then.
"Where are they off to, those two?" he asked in some astonishment.
"Gone for an early morning stroll," Mrs. Roy replied, "Mani says it's good for health."
Mr. Roy said, "Yes, so I hear. The books on hygiene also say so."

খবরের কাগজ এসে গেল।

Mr. Roy picked it up. He always looks at the weather bulletin first.
He said, "It says here it's going to be a fine day today."
He looked up at the sky.
"It is a fine morning," he said. "Shall we go out for a walk, too, you and I?"
Mrs. Roy said, "Let's wake up Milly, too. She'll love to come with us."

অতএব দেখা গেল, মিলিও তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। ততক্ষণ বাবা খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছেন।

He said, "I see in today's Anandabazar, it has been raining in the sub-Himalayan regions. I wish we had some rain here."

এবারে লক্ষ করো, এই বাক্যগুলোতে ক্রিয়াপদে বর্তমানকালের ব্যবহার। ইংরেজিতে এসব ক্ষেত্রে বর্তমানকালই ব্যবহার করা হয়।

They say it's good for health.
Mani says it's good for health.
So I hear.
The books on hygiene also say so.
It says here it's going to be a fine day.
I see in today's Anandabazar, it has been raining in the sub-Himalayan region.

কারও কাছ থেকে চিঠি পেলে তুমি বলবে :
My friend writes to say he can't come this week.

প্রসাদ

অর্থ জানো

সাবুদ … মশগুল

যে ছেলেটি 'তেজপাতা' বোঝাতে 'তৈজসপত্র' লেখে, বুঝতে হবে তার শব্দের কান আছে, কিন্তু শব্দের ভিতরে যাবার কৌতূহলী মন নেই। থাকলে সে জানত যে, তৈজসপত্র শব্দের অর্থ ধাতুর বাসন-কোসন। এইভাবে কত শব্দই তো আমরা কানে শুনেই নিশ্চিন্ত হয়ে মনে রেখে দিই, আর তার ভুল প্রয়োগ করি। নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **সাক্ষীসাবুদ**— (ক) সাক্ষী ও প্রমাণ, (খ) সাক্ষী ও তার লোকজন, (গ) সাক্ষী ও জামিনদার, (ঘ) সাক্ষী ও উকিল।

২। **বিলোল**—(ক) বাঁকা,(খ) স্থির,(গ) চঞ্চল,(ঘ) সুন্দর।

৩। **মশগুল**— (ক) উল্লসিত, (খ) নিরত, (গ) মত্ত, (ঘ) ব্যতিব্যস্ত।

৪। **উষ্ণীষ**— (ক) টুপি, (খ) মুকুটের পালক, (গ) শিরোভূষণ, (ঘ) পাগড়ি।

৫। **কপোল**— (ক) মুখ, (খ) কপাল, (গ) গাল, (ঘ) ললাটপার্শ্ব।

উত্তর : ১। সাক্ষীসাবুদ— (ক) সাক্ষী ও প্রমাণ। মূলে আছে ফারসি সাবুত শব্দ, যার অর্থ শক্ত বা জোরালো। বাংলায় তা প্রমাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'সে হাইকোর্টের রায় মাথায় করিয়া পরলোক যাত্রা করিয়াছে। সুতরাং সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত করিবার আমার আর উপায় নাই' (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)।

২। **বিলোল**— (গ) চঞ্চল। যেমন, 'রোহিণীর সেই ঊর্ধ্ববিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ' (বঙ্কিমচন্দ্র)। কটাক্ষ অর্থ চোরা চাহনি।

৩। **মশগুল**— (খ) নিরত। মূলে আরবি মশগুল শব্দ রয়েছে, যার অর্থ নিরত বা আবিষ্ট। যেমন, 'মেধাবী ছেলে বাপের মতোই পড়াশোনায় মশগুল থাকত' (মুজতবা আলী)।

৪। **উষ্ণীষ**— (ঘ) পাগড়ি। এটি সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ যা উষ্ণ বিনাশ করে। 'উষ্ণীষ আনি মাথায় চড়ায়' (রবীন্দ্রনাথ)।

৫। **কপোল**— (গ) গাল। মূলে সংস্কৃত শব্দ কপোল, যার অর্থ যা কাঁপে বা চঞ্চল হয়। 'এক বিন্দু নয়নের জল কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' (রবীন্দ্রনাথ)।

দেব-সেনাপতি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

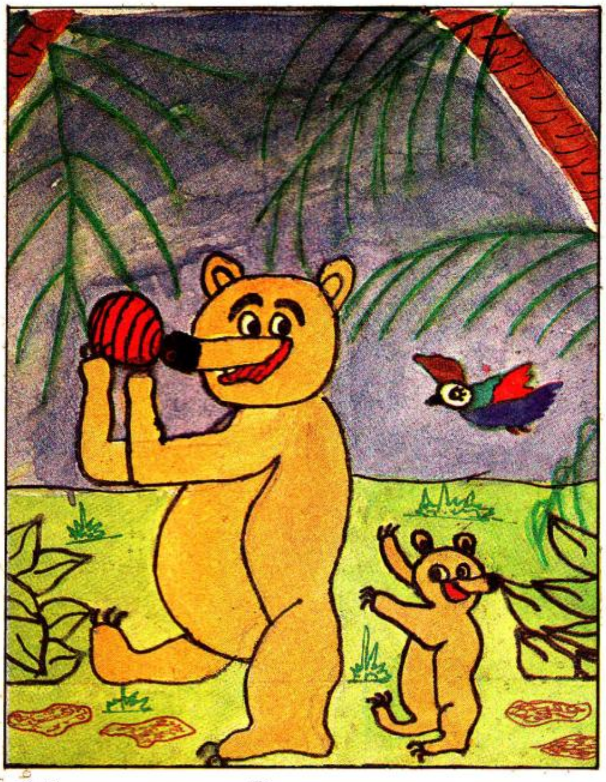

ছবি এঁকেছে **রুম্পা ঘোষ দস্তিদার** (বয়স ১০)

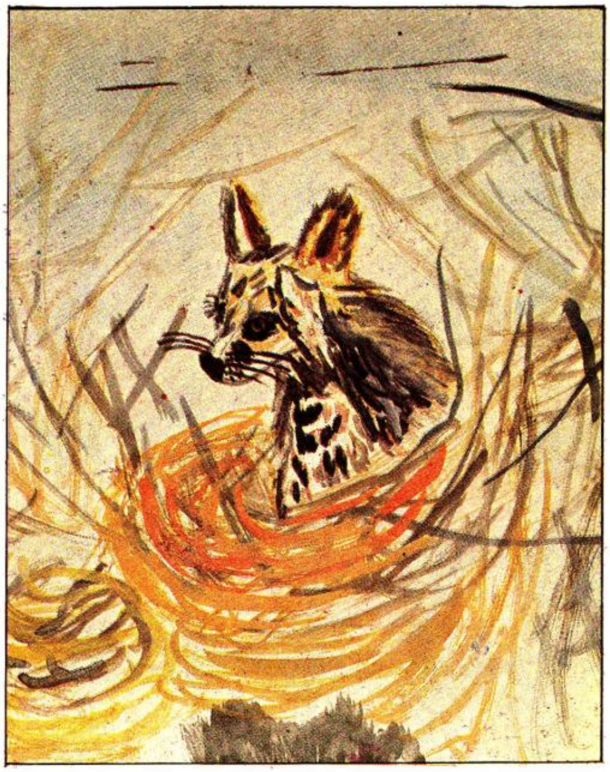

ছবি এঁকেছে **স্বপ্না ঘোষ** (বয়স ৯)

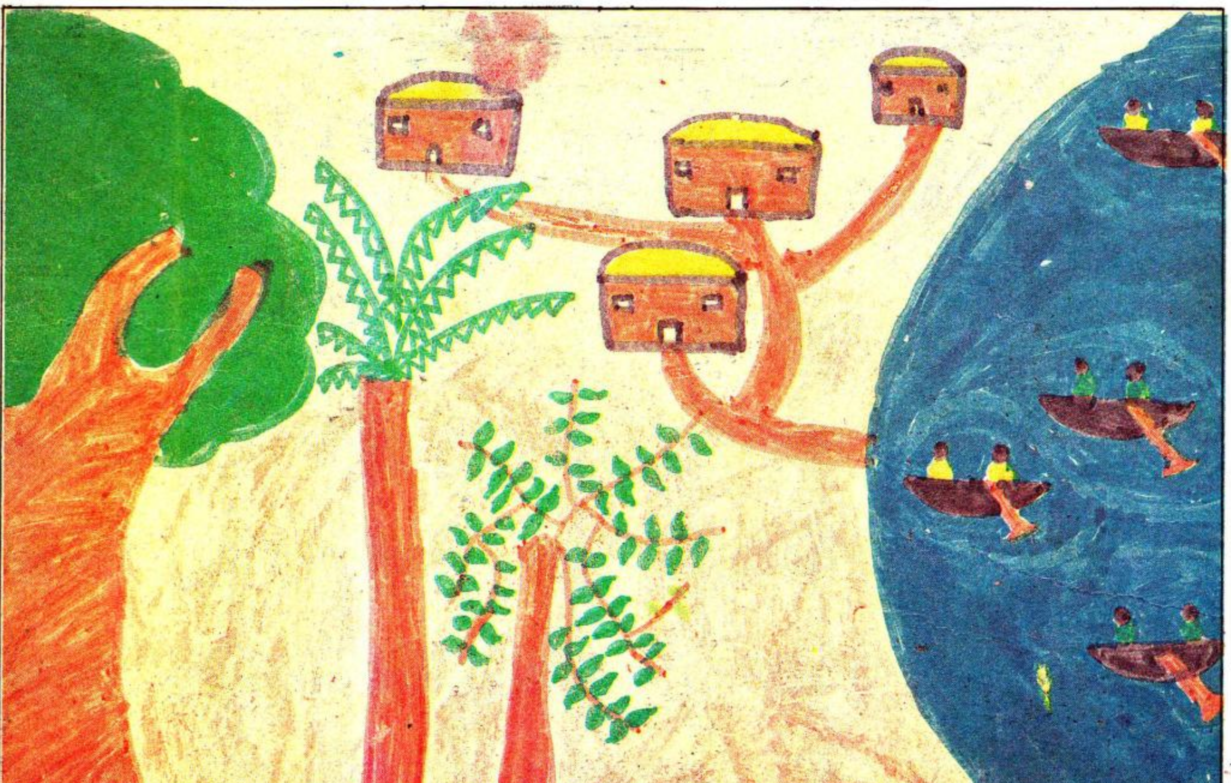

ছবি এঁকেছে **রেশমি কয়াল** (বয়স ৯)

মিঠু ফিরে এল

অনেক দিন পরে আমাদের বাড়িতে আবার মিঠুর জন্য লাল লঙ্কা আর কাঁচা পেয়ারা এল, কারণ আমাদের অনেক দিনের আদরের চন্দনা পাখি মিঠু আবার ফিরে এসেছে। আমাদের সকলের মনই আজ খুব খুশি, মিঠু ফিরে এসেছে বলে।

এমনিতে মিঠু উড়ে যাবার জন্য কোনওদিন আগ্রহ দেখায় না, দিন-সাতেক আগে একদিন ওকে ছাদে চান করাতে নিয়ে গেছি, হঠাৎ ও খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে উড়ে গেল, নীল আকাশ দেখে ও বোধহয় মুক্তি পেতে চেয়েছিল। আমার খুব কষ্ট হল, তবু খুশি হলাম এই ভেবে যে অনেক দিন পরে মিঠু নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে।

কিন্তু হায়, নিজেকে মুক্ত করার শক্তি ওর তখন আর নেই। হঠাৎ আমাদের কাজের দিদির কাছে খবর পেলাম যে আমাদের পাড়ায় এক বাড়িতে ও ধরা পড়েছে, বাবার সঙ্গে সেখানে গিয়ে শুনলাম যে তিনদিন ও কিছু খায়নি সবকিছু দেওয়া সত্ত্বেও।

আমি গিয়ে ওকে 'মিঠু' বলে ডাকতেই ও আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আর গম্ভীর গলায় বলে উঠল, "টুয়া পড়তে বোসো।" তারপর এক নাগাড়ে বাড়ির সকলের নাম ধরে ডেকে চলল, "টুয়া, পাপু, বাবু।"

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১১)

ডাকনাম

মা ডাকেন বনি,
দিদা খুকুমণি।
ডাকেন আমায় বাবা,
এত্তটুকুন আভা।
ডাকেন আমায় কাকু,
মেয়ে যেন নয় ডাকু।
ভালই লাগে আমার,
এসব ডাক শুনে।
রাগ হয় যে শুধু,
দাদা ডাকলে খুনে।

পিয়ালি মুখোপাধ্যায় (বয়স ৮)

ছবি এঁকেছে **ঋতুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়** (বয়স ১০)

রোগে ভুগে

বালিশ তোশক লেপ কাঁথা
ম্যালেরিয়া আর মাথাব্যথা।
জলপটি আর কুইনাইন
দশ দিন ভুগে নাড়ি বড় ক্ষীণ।
হরলিকস, দুধ, শরবতি
এই ছাড়া আর নেই গতি।
স্নান, ভাত আর জ্যান্ত মাগুর
কে ধার ধারে বার্লিসাগুর।

অনিরুদ্ধ বাড় (বয়স ১১)

বুটিদার ফেট্টি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : মায়ের মৃত্যুর পর হেলেন স্টোনার ও তার বোনের অভিভাবক হন তাদের বিপিতা। মানুষটি অত্যন্ত বদমেজাজি। মায়ের উইলে তাঁর টাকাকড়ি দুই বোনকে দেওয়া হয়েছে। জুলিয়ার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের বিয়ে হবার কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের আগেই জুলিয়া হঠাৎ মারা যায়। তারপর···

শার্লক হোমস এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপচাপ আরামকেদারায় গা এলিয়ে বসে ছিল। চোখ দুটো একটু ফাঁক করে আমাদের মক্কেলকে লক্ষ করে এবারে সে বললে, "ঠিক যা-যা ঘটেছে, সব আমাকে খুলে বলুন। অপ্রয়োজনীয় মনে করে কোনও কথাই বাদ দেবেন না, শুধু এইটুকু আমার অনুরোধ।"

হেলেন স্টোনার বললেন, "না না, কোনও কথাই আমি বাদ দেব না।"

"বেশ, তাহলে আপনার বোনের মৃত্যুর ব্যাপারটা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সব বলুন। যা যা ঘটেছিল, সবই আমি শুনতে চাই।"

"তখন যা যা ঘটেছিল, তা সবই আমি আপনাকে ঠিকভাবে বলতে পারব। সেই নিদারুণ ঘটনা আমার মনে দাগ কেটে বসে গেছে। আগেই বলেছি যে, আমাদের বাড়িটা খুবই পুরনো। বড় বাড়ির একটা দিকে আমরা থাকি, অন্য দিকটা এমনি পড়ে থাকে। আমরা যে অংশে থাকি তার একদিকে পরপর তিনটে ঘর। ঘরগুলোর পিছনে বাগান। বাগানের দিকে জানালা। ঘরগুলোর সামনের দিকে একটা বারান্দা। বারান্দার আর-এক দিকে বসবার ঘর। এই ঘরগুলোর প্রথমটায় থাকেন আমাদের বিপিতা। মাঝেরটায় থাকত জুলিয়া। শেষেরটায় থাকি আমি। এই ঘরগুলোর ভেতরে কোনও দরজা নেই, যাতে করে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়া যায়। আমি কি আপনাকে কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি, মিঃ হোমস ?"

"খুব চমৎকারভাবে গুছিয়ে বলেছেন।"

"আগেই বলেছি যে, ঘরগুলোর জানলা সবই বাগানের দিকে। সেই সাংঘাতিক কালরাত্রিতে যা ঘটেছিল এবার সেই কথায় আসি। আমাদের বিপিতা সেদিন অন্যদিনের চেয়ে একটু আগেই শুয়ে পড়েছিলেন। তবে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়েননি, জেগেই আছেন। তাঁর ঘর থেকে খুব কড়া ভারতীয় তামাকের গন্ধ বের হচ্ছিল। আমার বোন তামাকের ওই রকম কড়া গন্ধ মোটেই সহ্য করতে পারত না। তাই সে আমার ঘরে এসে বসেছিল। আমরা দু'জনে বিয়ের যোগাড়যন্ত্র নিয়ে কথা কইছিলাম। ঘড়িতে এগারোটা বেজেছে দেখে জুলিয়া উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, 'আচ্ছা হেলেন, রাত্তিরবেলায় তুমি কি কোনও শিসের শব্দ শুনেছ ?'

"'না তো।'

"'তুমি নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোরে শিস দাও না ?'

"'মোটেই নয়। কিন্তু হঠাৎ শিস দেবার কথা বলছ কেন ?'

"'বলছি এই জন্যে যে, গত কয়েক রাত্তিরে ঠিক তিনটে নাগাদ আমি পরিষ্কার অথচ চাপা শিস শুনেছি। তুমি জানো যে, আমার ঘুম খুব পাতলা। শিসের শব্দ কানে গেলেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঠিক কোথা থেকে যে শব্দটা আসে, বুঝতে পারি না। একবার মনে হয় পাশের কোনও ঘর থেকে আসছে, আবার মনে হয় যে, বাগান থেকে আসছে। তাই ভাবলাম তোমাকে জিজ্ঞেস করে দেখি তুমিও ও রকম কোনও শিসের শব্দ শুনেছ কি না।'

"'না আমি শুনিনি। মনে হয় ওই হতচ্ছাড়া বেদেগুলোর কাণ্ড।'

"'তাই হবে। তবে শব্দটা যদি বাইরের বাগান থেকেই আসে, তবে তোমারও শুনতে পাওয়া উচিত ছিল। তুমি শুনতে পাচ্ছ না কেন ?'

"'সোজা ব্যাপার। আমার ঘুম গাঢ়, চট করে ভাঙে না।'

"'ঠিকই বলেছ। যাই হোক, এটা এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়।' মুচকি হেসে জুলিয়া চলে গেল। একটু পরেই শুনলাম জুলিয়া ঘরের খিল লাগিয়ে দিলে।"

"আচ্ছা ! আপনারা কি বরাবর ঘরের খিল লাগিয়ে শুতে যান ?" হোমস প্রশ্ন করলে।

"হ্যাঁ, বরাবর।"

"কেন ?"

"আপনাকে যে আগে বললাম, আমাদের বিপিতার পোষা একটা চিতা আর একটা বেবুন আছে। সেগুলো রাত্তিরে ছাড়া থাকে। তাই রাত্তিরবেলায় ঘরের দরজা ভেতর থেকে খিল না দিলে আমরা নিশ্চিন্তে শুতে পারি না।"

"ঠিক কথা। তারপর কী হল বলুন।"

"সেই রাত্তিরে আমার ভাল ঘুম হল না। মনের মধ্যে কেমন একটা অজানা আশঙ্কা ভর করলে। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই যে, আমি বলেছিলুম আমরা যমজ। আপনি তো জানেন যে, যমজদের মধ্যে মনের টান খুব বেশি হয়। সেই রাত্তিরে ভীষণ দুর্যোগ চলছিল। তুমুল বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া জানলার শার্সিতে বারবার আছড়ে পড়ছিল। হঠাৎ হাওয়ার গোঙানি আর বৃষ্টির ঝরঝর শব্দকে ছাপিয়ে আমার কানে এল এক মেয়েলি কণ্ঠের প্রাণফাটা তীব্র চিৎকার। শুনেই বুঝলাম, আমার বোনের গলা। আমি লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। একটা গরম চাদর কোনও রকমে জড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে বারান্দায় পা দিতেই স্পষ্ট একটা শিসের শব্দ শুনতে পেলাম। ঠিক যে রকম শিসের কথা জুলিয়া বলেছিল। তার একটু পরেই ঝনঝন শব্দ শুনলুম, মনে হল ধাতু দিয়ে গড়া কোনও জিনিস পড়ল। আমি ছুটে আমার বোনের ঘরের কাছে যখন গেলাম, তখন দেখলুম,

ঘরের দরজা খোলা। দরজার একটা পাল্লা হাওয়ায় অল্প-অল্প দুলছে। আমার মনে হচ্ছিল আমার বোনের ঘর থেকে সাংঘাতিক একটা কোনও কিছু বোধহয় বেরিয়ে আসবে। বারান্দা থেকে যেটুকু আলো দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে গিয়ে পড়ছিল, তাতে দেখলাম আমার বোন মাতালের মতো হাত নাড়তে নাড়তে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। ভয়ে তার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল। আমি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। আর তখনই সে ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেল। মনে হল তার পায়ে যেন বল নেই। মাটিতে পড়ে সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল। তার শরীর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল। প্রথমে আমার মনে হল যে, সে আমাকে চিনতেই পারেনি। তাই আমি হেঁট হয়ে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতে ও বলে উঠল, 'ও ভগবান! হেলেন, হেলেন, একটা ফেট্টি। বুটিদার ফেট্টি।' এছাড়াও হয়তো ও আর কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। যন্ত্রণায় ও তখন কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছিল। জুলিয়া কোনও রকমে আমার বিপিতার ঘরের দিকে দেখাল। আমি ছুটে ডাক্তারের ঘরের দিকে গেলাম। ডাক্তার গায়ে ড্রেসিং-গাউন চাপাতে চাপাতে বেরিয়ে এলেন। যখন তাঁকে নিয়ে জুলিয়ার ঘরে এলাম, তখন তার জ্ঞান ছিল না। আমার বিপিতা তাকে ব্রাণ্ডি খাইয়ে চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেন। তখন ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। জুলিয়া আস্তে-আস্তে নেতিয়ে পড়ল। সে আর জাগল না। এইভাবে আমার বোনটি মারা গেল।"

শার্লক হোমস বলে উঠল, "ওই শিসের শব্দ আর ঝনঝনানি শুনতে আপনার ভুল হয়নি তো? আপনি আদালতে শপথ করে বলতে পারবেন তো?"

"এ-কথা ওখানকার করোনারও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি ঠিকই শুনেছি। তবে সেই ঝড়জলের মধ্যে আর আমাদের পুরনো বাড়ির নানা রকমের শব্দের মধ্যে আমার ভুলও হয়ে থাকতে পারে।"

"আচ্ছা, আপনার বোন কি বাইরে বেরোবার জামাকাপড় পরেছিলেন?"

"না। এমনি শোবার পোশাক পরেছিল। ওর ডান হাতের মুঠোয় ছিল একটা পোড়া দেশলাই-কাঠি, আর বাঁ হাতের মুঠোয় একটা দেশলাই-বাক্স।"

"বোঝাই যাচ্ছে যে, বিপদের আঁচ পেয়ে তিনি দেশলাই জ্বেলে ঘরের চারদিক দেখছিলেন। এটা একটা মস্ত বড় সূত্র। আচ্ছা, সব দেখেশুনে করোনার কী ঠিক করলেন?"

"আমাদের বিপিতাকে স্থানীয় লোকেরা একদম পছন্দ করে না। তাই করোনার ভদ্রলোক এই ব্যাপারে খুব খুঁটিয়ে তদন্ত করেছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও জুলিয়ার মৃত্যুর কোনও কারণ বা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। আমার সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হল যে, জুলিয়ার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ঘরের জানালার পাল্লা বেশ মজবুত আর জানলার পাটি দুটো ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া ছিল শক্ত করে। ঘরের মেজে দেওয়াল সব ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করা হল। নিরেট শক্ত। কোথাও এতটুকু ফাঁকফোকর নেই। ঘরের চিমনিটা অবশ্য বেশ বড় আকারের। কিন্তু সেটার ভেতর শক্ত লোহার পাত এমন আড়াআড়িভাবে বসানো যে, সেটা দিয়ে ঢোকা বা বেরুনো কোনও লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এ-কথা ঠিকই যে, যে-ভাবেই আমার বোনের মৃত্যু হোক না কেন, ঘরে সে একলাই ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, তার শরীরে কোনও আঘাত বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি।"

"তাকে তো বিষ দিয়ে মারা হয়ে থাকতে পারে?"

"ডাক্তারেরা সে-পরীক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু কোনও প্রমাণ পাননি।"

"আপনার বোনের মৃত্যুর সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?"

"আমার মনে হয়, বেচারা স্রেফ ভয় পেয়েই মারা যায়। তবে কেন যে সে ওরকম সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল, তা অবশ্য আমি বলতে পারব না।"

"তখন আপনাদের বাগানে কি বেদেরা ছিল?"

"হ্যাঁ, ছিল। সব সময়ই একটা-না-একটা দল থাকে।"

"তাই নাকি? আচ্ছা, মারা যাবার ঠিক আগে আপনার বোন যে ফেট্টি, বুটিদার ফেট্টির কথা বলেছিলেন, সেটা আপনি কী ভাবে ব্যাখ্যা করবেন?"

"এক-একবার মনে হয় যে, সে যন্ত্রণার ঘোরে ভুল বকছিল। আবার এক এক সময়ে মনে হয় যে, সে কোনও লোক বা দলের কথা বোঝাতে চেয়েছিল। হয়তো সে-সময় আমাদের বাগানে যে বেদের দল ছিল, তাদেরই ও বোঝাতে চেয়েছিল। আমি জানি না বেদের দলের কেউ কেউ যে মাথায় বুটিদার রঙিন রুমাল বাঁধে, সেই কথাই ও অদ্ভুত উপমা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল কি না।"

শার্লক হোমস মাথা নাড়লে। তার মাথা নাড়ার ধরন দেখে আমি বুঝলাম যে, ওই ব্যাখ্যায় সে মোটেই খুশি হয়নি।

হোমস বলল, "হুঁ, এ দেখছি গভীর জল। যাক্, এখন আপনি আপনার কথা বলুন।"

"ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর দুটো বছর কেটে গেছে। আমি আগের চেয়ে এখন আরও একলা হয়ে গেছি। মাসখানেক আগে আমার নিজের বাবার এক বন্ধু তার ছেলে পার্সি আর্মিটাজের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। মাস দুয়েক পরে আমাদের বিয়ে হবার কথা। আমার বিপিতা এই বিয়েতে মত দিয়েছেন। দিনদুয়েক হল আমাদের বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ হচ্ছে। বাড়ির পশ্চিম অংশটা মেরামত হচ্ছে। সারাবার সময় মিস্ত্রিরা অসাবধানে আমার ঘরের দেওয়ালে একটা ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। সেই জন্যে আমাকে আমার বোনের ঘরে থাকতে হচ্ছে। যে খাটে, যে বিছানায় সে শুত, সেই খাটে সেই বিছানায় আমাকে শুতে হচ্ছে। একবার ভাবুন আমার মনের কী অবস্থা হল, যখন কাল রাত্রে বিছানায় শোবার পর ঘুম আসছিল না বলে আমার বোনের কথা ভাবতে ভাবতে আমার কানে এল যেন কেউ চাপা গলায় শিস দিচ্ছে। রাত্তিরবেলা চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি স্পষ্ট শিসের শব্দ শুনলুম। আমি এক লাফে খাট থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ঘরের আলো জ্বাললুম। সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউকে দেখতে পেলুম না। আমার এত ভয় হল যে, আর শুতে পারলুম না। সারারাত জেগে কাটিয়ে দিলাম। তারপর ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে কোনও রকমে তৈরি হয়ে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লুম। তারপর 'ক্রাউন ইন্' পর্যন্ত হেঁটে এসে একটা গাড়ি ভাড়া করে এলুম লেদার হেডে। তারপর সেখান থেকে এই সাতসকালে আপনার কাছে

এসে হাজির হয়েছি, আপনার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলে আপনার পরামর্শ নিতে।"

"আপনি ঠিক কাজই করেছেন। তবে আপনি কি সব কথা খুলে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, সব কথাই বলেছি।"

"না, মিস স্টোনার, আপনি সব কথা বলেননি। আপনি আপনার বিপিতাকে বাঁচিয়ে কথা বলছেন।"

"মানে? আপনি কী বলছেন?"

মিস্ স্টোনারের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে তার জামার হাতাটা হোমস একটু সরিয়ে দিলে। ভদ্রমহিলার ফর্সা হাতের কব্জির কাছে কালশিটে পড়ে পাঁচ আঙুলের দাগ হয়ে গেছে।

"আপনার ওপর অত্যাচার তো দেখছি কম হয় না," হোমস বললে।

লজ্জায় ভদ্রমহিলার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর কব্জিটা চাপা দিয়ে দিলেন। "আমার বিপিতা খুব কড়া ধাতের মানুষ। অনেক সময়ে তাঁর গায়ের জোর যে কী ভীষণ সে কথাটা খেয়াল থাকে না।"

এরপর আর কেউ কোনও কথা বললে না। হোমস ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর হোমস বললে, "খুব ঘোরালো ব্যাপার। আমরা কোন্ পথে কীভাবে তদন্ত শুরু করব, তা ঠিক করবার আগে অনেকগুলো ছোটখাটো খবর আমাকে যোগাড় করতে হবে। অথচ মুশকিল হল, আমাদের হাতে সময় একদম নেই।...ভাল কথা, আজ কোনও এক সময়ে যদি স্টোক মোরানে যাই, আপনার বিপিতাকে না-জানিয়ে আপনাদের বাড়িটা কি ঘুরে দেখা সম্ভব হতে পারে?"

"হ্যাঁ, হবে। এটা সৌভাগ্যই বলতে পারেন। আজ ওঁর লণ্ডনে কী সব কাজ আছে। কাজ সারতে গোটা দিনটাই লাগবে। তাই আজকে যদি আপনারা স্টোক মোরানে আসেন তো আমাদের বাড়ি ঘুরে দেখতে আপনাদের অসুবিধে হবে না। আমাদের বাড়িতে একজন কাজের লোক আছে। সে চব্বিশ ঘন্টাই থাকে। কিন্তু সে ভয়ানক বোকা। আর তার বয়স হয়েছে অনেক। তাকে আমি চালাকি করে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারব।"

"বাহ। ওয়াটসন, তোমার ঘুরে আসতে আপত্তি নেই তো?"

"মোটেই না।"

"বেশ। ওই কথাই রইল। আমরা দুজনেই যাব।...আপনি এখন কী করবেন?"

"লণ্ডনে যখন এসে পড়েছি, দু'একটা কাজ সেরে যাব। আমি ঠিক বারোটার গাড়িতে ফিরব। তাহলে আপনাদের যাবার আগেই বাড়ি পৌঁছে যাব।"

"আমরা দুপুরের একটু পরেই পৌঁছব। ইতিমধ্যে আমাকেও দু'একটা খুঁটিনাটি কাজ সেরে নিতে হবে। ...আপনি কি আমাদের সঙ্গে প্রাতরাশ সারবেন?"

"ধন্যবাদ। আজ নয়। আমাকে এখন উঠতে হবে। আপনাকে আমার কথা সব খুলে বলতে পেরে মনটা ভীষণ হালকা লাগছে। খুব চাঙ্গা লাগছে নিজেকে। এখন তা হলে চলি। দুপুর বেলায় আবার আমাদের দেখা হবে।"

মুখের ওপর ওড়না চাপা দিয়ে ভদ্রমহিলা বেশ খুশি-খুশি ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভদ্রমহিলা চলে যাবার পর হোমস তার আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে আমাকে বললে, "তারপর ওয়াটসন, সব কথাই তো শুনলে। এখন তোমার কী মনে হয় বলো শুনি।"

"ব্যাপার যে বেশ জটিল আর মারাত্মক, সে-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই নেই।"

"হ্যাঁ, খুবই জটিল আর সাংঘাতিক রকমের মারাত্মক।"

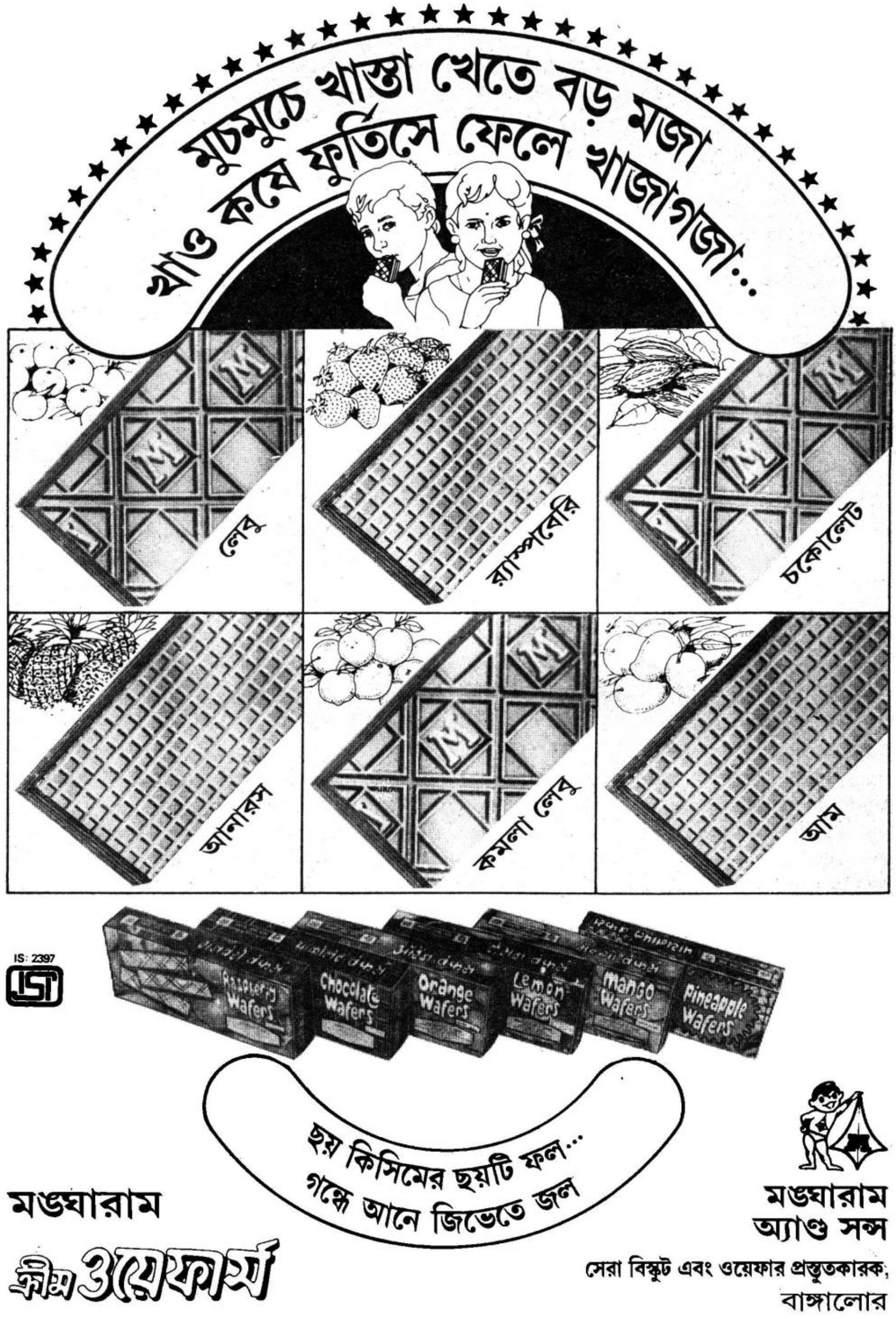
মুচমুচে খাস্তা খেতে বড় মজা
খাও কষে ফুর্তিসে ফেলে খাজাগজা...
লেবু
র‍্যাস্পবেরি
চকোলেট
আনারস
কমলা লেবু
আম
Jaisons
IS: 2397
ISI
Raspberry Wafers
Chocolate Wafers
Orange Wafers
Lemon Wafers
Mango Wafers
Pineapple Wafers
ছয় কিসিমের ছয়টি ফল...
গন্ধে আনে জিভেতে জল
মঙ্ঘারাম
ক্রীম ওয়েফার্স
মঙ্ঘারাম
অ্যাণ্ড সন্স
সেরা বিস্কুট এবং ওয়েফার প্রস্তুতকারক,
বাঙ্গালোর

"কিন্তু ভদ্রমহিলা যা বললেন, তা যদি সত্যি হয়, মানে ঘরের মেজে, দেওয়াল, জানালা, চিমনির নল দিয়ে কারও পক্ষে ঢোকা বা বেরুনো যদি সত্যিই অসম্ভব হয়, তা হলে একথা তো অস্বীকার করা চলে না যে, ভদ্রমহিলার বোনের মৃত্যুর সময় তিনি একাই ঘরে ছিলেন।"

"তা হলে রাত্তিরে ওই শিসের শব্দটা কী ? আর মারা যাবার আগে ভদ্রমহিলা যে অদ্ভুত কথাগুলো বললেন, তারই বা মানে কী ?"

"বলতে পারব না।"

"শোনো, রাত্তিরবেলায় শিসের শব্দ, কাছাকাছি বেদের আস্তানা, ডাক্তারের সঙ্গে তাদের মেলামেশা, তার ওপর এই ভদ্রমহিলাদের বিয়ে না হওয়ায় ডাক্তারের স্বার্থ, মারা যাবার আগে ভদ্রমহিলার ওই অস্বাভাবিক উক্তি, মিস স্টোনারের ধাতু দিয়ে তৈরি কোনও-কিছু পড়ার ঝনঝন শব্দ শোনা, যেটা কোনও লোহার ভারী পাতকে সরিয়ে আবার ঠিক জায়গায় ফেলে দেবার শব্দ হওয়াই সম্ভব—এই সব সূত্রকে এক করলে মনে হয় না কি যে, এই পথ ধরে এগিয়ে গেলে সমস্যার সমাধান হবে ?"

"তা হলে এই ব্যাপারে বেদেরা কতখানি জড়িয়ে আছে বলে মনে করছ ?"

"আমি জানি না।"

"না, হোমস, তোমার এই থিওরিতে অনেক ফাঁক আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।"

"আমারও মনে হচ্ছে। আর ঠিক এই কারণেই আমি আজই স্টোক মোরানে যেতে চাইছি। ওখানে গিয়ে আমি দেখতে চাই যে, এই ফাঁকগুলো কতখানি গুরুতর, অথবা এই ফাঁকগুলোকে অন্য কোনও ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কি না।...আরে, এটা আবার কী হল ?"

হোমস শেষ কথা কটা বললে এক অদ্ভুত পোশাক-পরা ভদ্রলোককে লক্ষ করে। বিরাট দৈত্যের মতো চেহারার এই লোকটি আমাদের কোনও রকম জিজ্ঞেস না করেই দড়াম করে এক ধাক্কায় দরজা খুলে আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ভদ্রলোক ডাক্তার আর কৃষিজীবী দু'ধরনের লোকের পরিচ্ছদ মিলিয়ে একটা খিচুড়ি টাইপের পোশাক পরেছেন। মাথায় কালো লম্বা টুপি। গায়ে লম্বা ফ্রককোট, পায়ে গেটার। হাতে একটা বেশ মজবুত চাবুক। ভদ্রলোক চাবুকটা অল্প-অল্প দোলাতে লাগলেন। ভদ্রলোক এত লম্বা যে, তাঁর টুপিটা দরজার কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে ঠেকে গিয়েছিল। আর তাঁর বুকের ছাতি প্রায় আমাদের ঘরের দরজার সমান চওড়া। শরীরের তুলনায় ভদ্রলোকের মুখটা বড়। মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়ে ভাঁজ পড়েছে। গায়ের রং রোদে পোড়া। ভদ্রলোক বেশ রাগ-রাগ মুখ করে আমাদের দেখছিলেন। ওঁর চোখ দুটো ভেতর দিকে ঢোকানো, চোখের রং হলুদ। নাকটা বেশ চোখা। ওঁকে দেখে, কী জানি কেন, আমার শিকারি-পাখির কথা মনে হল।

সেই বদখত ধরনের লোকটি বললেন, "আপনাদের মধ্যে কার নাম হোমস ?"

যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব করে হোমস বললে, "আমার নাম। আপনার নামটি জানতে পারলে সুখী হই।"

"আমি ডঃ গ্রিমসবি রয়লট, স্টোক মোরানে থাকি।"

খুব আপ্যায়নের ভঙ্গিতে হোমস বললে, "আরে, তাই নাকি। ডাক্তার, আপনি বসুন।"

"না, আমি বসতে আসিনি। আমার একটি আত্মীয়া আপনার কাছে এসেছিল। তাকে আমি এখানে আসতে দেখেছি। সে আপনাকে কী বলছিল ?"

হোমস বললে, "ডাক্তার, দেখছেন, অন্য বছরের তুলনায় এবার এখনও বেশ ঠাণ্ডা রয়েছে।"

ভদ্রলোক গর্জে উঠলেন, "সে আপনাকে কী বলছিল ?"

একটুও বিচলিত না হয়ে হোমস বললে, "তবে সবাই বলছে, ক্রকাসের পক্ষে এ ঠাণ্ডা ভাবটা খুব ভাল।"

"ও, আমার কথার জবাব দেবেন না ? আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে ?" হোমসের দিকে দু'চার পা তেড়ে এসে ডাক্তার রয়লট বললেন, "আপনাকে আমি চিনি। আপনার কথা আমার কানে এসেছে। আপনার স্বভাব হচ্ছে সব ব্যাপারে নাক গলানো।"

হোমস অমায়িকভাবে হাসল।

"আপনি হচ্ছেন গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হোমস।"

হোমসের মুখে হাসি আর ধরে না।

"আপনি হচ্ছেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দালাল।"

হাসতে-হাসতে হোমস আর-একটু হলে চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। "ওহ, আপনি দেখছি দারুণ মজার-মজার কথা বলতে পারেন। বেরিয়ে যাবার সময় কিন্তু মনে করে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবেন, খুব হাওয়া আসছে।"

"আমার যা বলবার তা বলা হলেই আমি চলে যাব। আমার ব্যাপারে খবরদার নাক গলাবেন না। আমি জানি, মিস স্টোনার এখানে এসেছিল। তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। আমি কিন্তু সোজা লোক নই। আমাকে চটাবেন না। দেখুন তবে—" বলেই ভদ্রলোক চোখের পলকের মধ্যে ফায়ারপ্লেসের আগুন খোঁচাবার লোহার ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে স্রেফ হাতের চাপে দুমড়ে দিলেন।

"আমার হাতের নাগালের বাইরে থাকবেন।" ডাণ্ডাটা ফায়ারপ্লেসের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হোমস হাসতে হাসতে বললে, "ভদ্রলোককে বেশ মিশুকে বলে মনে হল। আমি অবশ্য ওর মতো ষণ্ডা মার্কা নই। তবে একটু দাঁড়ালে দেখতে পেতেন যে, আমার কব্জির জোরও ওঁর চেয়ে কম নয়।" লোহার ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে এক হেঁচকা টানে হোমস সেটাকে সোজা করে ফেললে।

"ওঁর আস্পর্ধার কথাটা একবার ভাবো। আমাকে কিনা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দালাল বলা। এই কথাটার জন্যেই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবার উৎসাহ আমার বেড়ে গেল। মিস স্টোনার আমাদের কাছে আসাটা গোপন রাখতে পারেননি দেখছি। এই জন্যে ওই জংলি পাষণ্ডটা ওঁর ওপর না আবার অত্যাচার করে।...এসো ওয়াটসন, আগে খাওয়া-দাওয়ার পাটটা সাঙ্গ করা যাক। তারপর আমি একবার 'ডক্টরস্ কমনসে' যাব। সেখানে হয়তো এমন-কিছু খবর পেতে পারি, যাতে তদন্ত করাটা সহজ হবে।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শৈলেন ঘোষ আর এ-যুগের রূপকথা

শৈলেন ঘোষ এ-কালের একমাত্র সফল শিশুসাহিত্যিক যিনি বাংলা রূপকথার আবহমান ধারাটিকে প্রায় একক প্রচেষ্টায় বহন করে চলেছেন। তাঁর চরিত্ররা কেউই তেমন অচেনা নয়, কিন্তু তাদের নিয়ে যে-ভঙ্গিতে গল্প বলেন শৈলেন ঘোষ, সেই ভঙ্গিতে মিশে থাকে রূপকথার এক অপরূপ মেজাজ। ঠিক এই মেজাজে এখনকার কোনো সাহিত্যিক ছোটদের জন্য লেখেন বলে মনেই পড়ে না।

মানুষ, বাঘ, বাঁদরছানা, ডাইনিবুড়ি, কুমির, পাখি, মাছ, নদী— এরা সব তাঁর গল্পে অবাক-করা চরিত্র। তবে চরিত্র যাই হোক না কেন, তাদের নিয়ে শোনানো গল্পের শেষে কিন্তু একটা মিল থাকেই। সে-মিল হল, একটা সুন্দর প্রেরণা যোগানোর মিল। ছোটরা যাতে জীবনের সব-রকম বাধাবিপত্তিকে জয় করতে শেখে, শৈলেন ঘোষের প্রতিটি কাহিনীতেই খুব সূক্ষ্মও প্রচ্ছন্নভাবে মিশে থাকে এমন একটা প্রেরণা। দক্ষিণারঞ্জন বা অবন ঠাকুর-এর ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরসূরী হয়েও শৈলেন ঘোষ নিজের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

শৈলেন ঘোষের বই : অরুণ বরুণ কিরণমালা ৮·০০ মিতুল নামে পুতুলটি ৬·০০ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৭·০০ বাজনা ৬·০০ হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৮·০০ আমার নাম টায়রা ৬·০০ আজব বাঘের আজগুবি ৭·০০ জাদুর দেশে জগন্নাথ ৮·০০ স্বপ্নের যাদুকরী ৭·০০ টোরা আর বাদশা ৮·০০ খুদে যাযাবর ইসতাসি ১২·০০ আবু ও দস্যুসর্দার ১০·০০ ইতিমিচিসাহেব ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কালবৈশাখী

সাধনা মুখোপাধ্যায়

কোনও একটা জায়গা যদি ক্রমান্বয়ে গরম হয়ে উঠতে থাকে, তা হলে সেই জায়গার ওপরের বাতাসও ক্রমশ গরম হয়ে ওঠে। বাতাস গরম হলেই হালকা হয়ে যায়, এবং তার চাপ কমে যায়। এই হালকা হাওয়া বা বাতাস ক্রমশই ওপরে উঠে যেতে থাকে, এবং এর ফলে একটা নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর কোনও স্থানই বায়ুশূন্য থাকতে পারে না, তাই আশপাশের উচ্চচাপ-অঞ্চল থেকে বাতাস ছুটে গিয়ে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে। সেই বাতাসও আবার উত্তপ্ত স্থানে গিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে যায়। ফলে উচ্চচাপ-অঞ্চল থেকে আরও বাতাস ছুটে আসে নিম্নচাপের দিকে—সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করতে। এইভাবেই ঝড়ের সৃষ্টি হয়।

ঝড়ের সময় বাতাস উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে চক্রাকারে ঘুরতে-ঘুরতে প্রবেশ করে। সেই জন্যে ঝড়ের সময় বাতাসের গতি ঘূর্ণির আকার ধারণ করে। উত্তর গোলার্ধে বাতাস ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরতে-ঘুরতে নিম্নচাপ-অঞ্চলে প্রবেশ করে। পশ্চিমবঙ্গে কালবৈশাখী ঝড় দেখা দেয় সাধারণত এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত। প্রধানত বৈশাখ মাসেই প্রবল আকারে দেখা দেয় বলে এর নাম কালবৈশাখী।

২১ মার্চ সূর্য নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। তারপর সূর্য ক্রমশই নিরক্ষরেখার উত্তরে লম্বভাবে কিরণ দিতে থাকে, এবং কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী হতে থাকে। এর ফলে ক্রান্তীয় অঞ্চল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। মাটি দিনের বেলায় যে তাপ গ্রহণ করে, রাত্রে তা সম্পূর্ণভাবে বিকিরণ করতে পারে না। এর ফলে স্থলভূমিতে তাপ সঞ্চিত থেকে যায়, স্থলভূমির ওপরের বাতাসও গরম হয়ে ওঠে, এবং ক্রমশ নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

এই নিম্নচাপ থেকেই সৃষ্টি হয় ঘূর্ণিঝড়ের—তখন আশপাশের উচ্চচাপ অঞ্চলের বাতাস ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরতে-ঘুরতে ছুটে এসে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকলে ঝড়ের সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টিও শুরু হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে গরমকালের গোড়ার এই ঝড়ের নামই কালবৈশাখী। উত্তর ভারতে গরমকালের এই ঘূর্ণিঝড়কে আঁধি বলা হয়। তবে সমুদ্রের কাছে বলে এবং হাওয়ায় জলীয় বাষ্প থাকার দরুন পশ্চিমবঙ্গের কালবৈশাখীর বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা বেশি।

সারাদিনের উত্তাপের পর বিকেলের দিকে শুরু হয় এলোমেলো হাওয়া, তারপর বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। কালবৈশাখীর পরে সমস্ত আবহাওয়াটা শীতল হয়ে যায়। সেই জন্যে বেশি গরম পড়লে সকলেই বলেন, একটু কালবৈশাখী আসুক।

উচ্চচাপ-অঞ্চল থেকে আগত হাওয়া নিম্নচাপ-অঞ্চলে এসে ওপরে উঠতে থাকে। মাটির সমতল থেকে উচ্চচাপের ভিজে হাওয়া অনেক উঁচুতে উঠে যাওয়ার ফলেই সৃষ্টি হয় কালবৈশাখীর। যতই ওপরে উঠতে থাকে, এই হাওয়া ততই ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ওপরে উঠে হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এর ফলে হাওয়ার ভিতরকার জলীয় বাষ্প বৃষ্টিতে পরিণত হয়। কিন্তু নীচ থেকে ওপরে উঠছে যে হাওয়া, সেই হাওয়া বৃষ্টির বিন্দুকে মাটিতে পড়তে বাধা দেয়। তবুও শিলা বা চড়বড় বৃষ্টির ফোঁটা বড়-বড় করে মাটিতে পড়তে থাকে, এবং শুরু হয় তুমুল বৃষ্টিপাত।

সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে ছোটনাগপুরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তখন বঙ্গোপসাগরে অপেক্ষাকৃত উচ্চচাপ। সেইজন্যে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস ছুটে যায়। পশ্চিম থেকে আগত শুষ্ক বাতাসের সঙ্গে এই জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাসের সংঘর্ষ হলেই ঝড়ঝঞ্ঝা ও মেঘের সৃষ্টি হয় এবং এই কারণেই এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় সমভূমিতে কালবৈশাখী আসে।

ঘূর্ণিঝড় বলতে শুধু কালবৈশাখীকেই বোঝায় না। ক্রান্তীয় অঞ্চলে অনেক রকমের ঘূর্ণিঝড় আছে—যেমন টাইফুন, হারিকেন, টর্নাডো—এক-এক জায়গার এক-এক রকম নাম। ঘূর্ণিঝড়ে মেঘের বৈশিষ্ট্য হল ঘন-ঘন বিদ্যুতের চমক আর কান-ফাটানো বাজ পড়ার আওয়াজ। ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ থেকে ১১০ কিলোমিটার। এই সময়ে ব্যারোমিটারে বা বায়ুচাপমান-যন্ত্রে দেখা যায়, বায়ুর চাপ অনেক নীচে নেমে গেছে। কাজে-কাজেই বায়ুচাপমান-যন্ত্রে বাতাসের চাপ নীচে নামতে দেখলেই বোঝা যায়, ঝড় আসছে।

ছবি : প্রবীর সেন

হিজলি হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক কী বলেন

খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিট্যুট অব টেকনোলজি, যাকে সংক্ষেপে আমরা আই· আই· টি· বলি, তারই বিশাল চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে হিজলি হাইস্কুল। বয়স মোটে বত্রিশ, কিন্তু এরই মধ্যে এই স্কুলটি শুধু মেদিনীপুর জেলায় নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট স্কুলগুলির পাশে নিজের জন্য একটি জায়গা করে নিয়েছে। আই· আই· টি·র কর্মী এবং আশপাশের অবহেলিত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধের জন্য ১৯৫৩ সালের ১০ ডিসেম্বর হিজলি হাইস্কুল গড়ে ওঠে। সেই সময় স্কুলের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, ছেলেমেয়েদের বসবার জন্য কোনও বেঞ্চের ব্যবস্থাও ছিল না। তারা মাদুরে বসে লেখাপড়া করত। তখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০। স্কুলের প্রথম প্রধানা শিক্ষিকা ছিলেন শ্রীমতী রমা দত্ত।

হিজলি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এখন প্রায় ১৫০০। সহশিক্ষার এই স্কুলটিতে বাংলা ইংরেজি হিন্দি—এই তিনটি মাধ্যমেই পড়ানো হয়। হিজলি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বেশ কয়েকবার সর্বভারতীয় গণিত ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী, রাজ্য ও জেলা বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদিতে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হয়ে প্রতিষ্ঠানের গৌরব বাড়িয়েছে। ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭৯-৮০ সালের জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মেধা পরীক্ষায় হিজলি হাইস্কুল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে পর পর দুবার শিল্ড ও পাঁচ হাজার টাকা লাভ করে। এই স্কুলের গ্রন্থাগারটি বিশাল, বই আছে প্রায় ১৪০০০। এত বড় গ্রন্থাগার জেলার আর কোনও স্কুলে নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিজলি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বহুবার স্ট্যাণ্ড করেছে। ন্যাশনাল স্কলারশিপ প্রতি বছরই থাকে। ১৯৭১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা বিভাগে স্কুলের ছাত্রী অলকা গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। ১৯৭৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে সুমনকুমার সিংহ তৃতীয় হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় চৈতালি চক্রবর্তী সপ্তম স্থান লাভ করেছিল। ১৯৮২ সালে মিতালি চক্রবর্তী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিল।

প্রতি বছর এই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় একশোরও বেশি ছাত্রছাত্রী। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় প্রায় ২০০ জন। ১৯৮২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ১১০ জন। প্রথম বিভাগে পাশ করেছিল ২৭ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৭১, তৃতীয় বিভাগে ৯। স্টার : ৫ জন। ১৯৮৩ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০৩। প্রথম বিভাগে ৪০। দ্বিতীয় বিভাগে ৩৭। তৃতীয় বিভাগে ১১। স্টার : ৫ জন। ১৯৮৪

সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩০। প্রথম বিভাগ ৩৫। দ্বিতীয় বিভাগ ৫৭। তৃতীয় বিভাগ ১৯। স্টার : ৬ জন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলও বেশ ভাল। ১৯৮২ সালে পাশের হার ছিল ৯২%, ১৯৮৩ সালে ৯৩·২%, ১৯৮৪ সালে ৯০·৩%।

ইংরেজি ও শিক্ষাতত্ত্বের এম· এ· শ্রীবিবেকানন্দ পাল হিজলি হাইস্কুলের বর্তমান প্রধানশিক্ষক। তাঁর শিক্ষকজীবনের অভিজ্ঞতা প্রায় চার দশকের।

ইংরেজি পঠনপাঠনের নানা দিক নিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। একসময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "ইংরেজি সম্পর্কে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর মনেই একটা ভয়ের ভাব আছে। এর কারণ কী ?" শ্রীপাল বললেন, "দেখুন, অধিকাংশ কথাটা ঠিক নয়, তবে কেউ কেউ যে ইংরেজিকে একটু ভীতির চোখে দ্যাখে এতে কোনও সন্দেহ নেই। এর কারণ কী জানেন ? যারা এই বিষয়টিকে ভয় পায়, তারা ক্লাসের পড়ায় মন দেয় না। বাড়ির পড়াও দরদ দিয়ে যত্ন দিয়ে পড়ে না। ভয় করলেই ভয় আরও জড়িয়ে ধরে—এটা জানা কথা। একটু মনোযোগ দিলেই এই ভয়ের ভাবটা কেটে যাবে।"

"ইংরেজিতে ভাল ফল করবার জন্য আপনি ছেলেমেয়েদের কীভাবে তৈরি হতে বলেন ?"

"ইংরেজিতে ভাল ফল করবার একটাই উপায়। বিষয়টির গভীরে ঢুকতে হবে, অর্থাৎ কিনা ক্লাসের বইটি পড়তে হবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এখন **বেশিরভাগ প্রশ্নই অবজেকটিভ**

টাইপের, কাজেই টেক্সট্ বইটি অত্যন্ত সতর্কভাবে আদ্যোপান্ত পড়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। প্রধানশিক্ষক আরও জানালেন, "টেক্সট্ বইটি শুধু পড়লেই হবে না, পড়ার সঙ্গে লিখতেও হবে সমানভাবে। দশ লাইন যদি পড়তে হয়, লিখতে হবে অন্তত পাঁচ লাইন।"

আমি প্রধানশিক্ষককে এই ব্যাপারটি একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার অনুরোধ জানাতে তিনি বললেন, "বাক্য গঠনের ব্যাপারটা ভালভাবে শিখতে না পারলে পরীক্ষায় ভাল নম্বর উঠবে না। **পড়া এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যদি লেখার অভ্যাস বাড়ানো যায়, তাহলে বাক্যগঠন প্রণালীটি আয়ত্ত করতে সময় লাগবে না। ক্লাসে গদ্য কিংবা পদ্য, যাই পড়ানো হোক না কেন, সেটি বাড়িতে, একবার নয়, বারবার পড়ে তার সারমর্ম খাতায় লিখতে হবে।** প্রথম প্রথম ভুল হবে, হোক, লজ্জার কিছু নেই। আবার লিখতে হবে। দরকার হলে আরও পাঁচবার। তারপর মাস্টারমশাই বা বড় কাউকে দেখিয়ে লেখার ভুল সংশোধন করিয়ে নিতে হবে। এইভাবে লেখার অভ্যাস বাড়ালে বানান ভুল কম হবে, অনেক অচেনা শব্দের মানে শেখা যাবে, ভাষার উপর দখল আসবে। তখন জড়তা এবং ভয়, দেখবেন, পালাতে পথ পাবে না।"

ইংরেজি ব্যাকরণের প্রসঙ্গ তুলতেই প্রধানশিক্ষক জানালেন, "ইংরেজি, হিব্রু, ল্যাটিন, যে-ভাষাই হোক না কেন, তার মূল কথাই হল ব্যাকরণ। ব্যাকরণ না-জেনে কোনও ভাষাই ভালভাবে রপ্ত করা যায় না।"

"এখনকার বাজার-চলতি নোটবইগুলি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী? নোটবই কি সত্যিই পড়ুয়াদের ক্ষতি করে?"

"আমি নোটবই ব্যবহারে পক্ষপাতী নই," প্রধানশিক্ষক শ্রীপাল বললেন, "অবশ্য নোটবই নিয়ে আমি 'গেল' 'গেল' রব তুলতেও রাজি নই। যে-সব বই ছেলেমেয়েদের কোনও মঙ্গল করে না, তা তো না-পড়লেই হয়।"

প্রধানশিক্ষক রেফারেন্স বই ও সংবাদপত্র পড়ার উপরেও বেশ জোর দিলেন। বললেন, "প্রতিদিন ইংরেজি খবরের কাগজ পড়া উচিত। খবরের কাগজ আমাদের চিন্তা ও চেতনার জগৎকে প্রসারিত করে। কত নতুন নতুন শব্দ, শব্দবন্ধের সঙ্গে নিত্য পরিচয় হয়, নানা ধরনের রচনা ও রচনারীতির সঙ্গে যোগাযোগ হয়, সেগুলো তো জিজ্ঞাসু পড়ুয়াদের কম কাজে লাগে না!"

বাংলা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও প্রধানশিক্ষক তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানালেন। বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল—যে বিষয়ই হোক পাঠ্যবইটিকে প্রিয় বন্ধুর মতো ভালবেসে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হবে। বাংলা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ইংরেজির মতোই। ইতিহাস সাল-তারিখের ব্যাপার, প্রয়োজনমতো মুখস্থ করতে হবে। ভূগোল ও বিজ্ঞানের জন্য মানচিত্র ও ছবি আঁকার কৌশল আয়ত্ত করা দরকার। অঙ্কের ব্যাপারে তাঁর একটিই পরামর্শ: অনুশীলন। 'একবার না-পারিলে দেখ শতবার।'

'আনন্দমেলা' সম্পর্কে প্রধানশিক্ষকের অভিমত, "সত্যিই সুন্দর কাগজ।"

শ্যামলকান্তি দাশ

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

ঝকঝকে চেহারা। উজ্জ্বল চোখ-মুখ। হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরে ঢুকেই বেশ সপ্রতিভভাবে ছেলেটি জানাল, তার নাম ময়ূখ মাইতি। সে-ই হিজলি হাইস্কুলে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়। আমি 'আনন্দমেলা'র লোক এবং কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, তা ময়ূখ জানে। জানে বলেই সে গড়গড় করে বলে গেল: ক্লাস সিক্স থেকেই এখানে পড়ছি। আমার মাধ্যম ইংরেজি। অ্যানুয়াল পরীক্ষায় মোট নম্বর ছিল ন'শো, আমি পেয়েছি সাতশো সাতাত্তর।

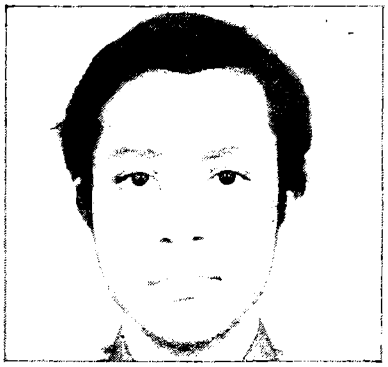

আমি ময়ূখকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি বরাবরই ফার্স্ট হও?"

"না, কখনও ফার্স্ট, কখনও সেকেণ্ড।" ময়ূখের চটপট জবাব।

"তুমি রোজ কতক্ষণ পড়ো?"

ময়ূখ বলল, "এমনিতে ছ'সাত ঘণ্টা তো পড়িই। তবে বেশিও হয় কখনও-কখনও। ছুটির দিনে কোনও ধরাবাঁধা সময় নেই।"

"তোমার প্রাইভেট টিউটর আছেন?"

"আছেন, একজন। বিজ্ঞান দেখিয়ে দেন," এক মুহূর্ত চুপ করে ময়ূখ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "আমার বাবা মাঝে-মাঝে আমায় অঙ্ক দেখিয়ে দেন।" ময়ূখের বাবা শ্রীমনোজকুমার মাইতি আই· আই· টি·র অঙ্কের অধ্যাপক।

"পড়াশুনো ছাড়া আর কী কী পছন্দ তোমার? মানে খেলাধুলো, ছবি আঁকা, পদ্য লেখা—এইসব আর কি।"

"খেলাধুলো খুবই প্রিয়, কিন্তু আমি নিজে কিচ্ছু খেলতে পারি না। খেলা দেখতে ভাল লাগে। আর পদ্য লেখা? ওরে বাবা, ও তো মহা শক্ত ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, ছবি আঁকতে পারি। আর গানও গাইতে পারি একটু-আধটু।"

"বাঃ, তুমি তো অনেক কিছু পারো দেখছি। একটু শোনাবে নাকি আমাদের?"

লজ্জায় মুখ নিচু করল ময়ূখ। বলল, "একটা কথা কিন্তু আনন্দমেলায় লেখা চাইই। আমি গল্পের বই পড়তে খুব ভালবাসি।"

"তোমার প্রিয় কয়েকটা গল্পের বইয়ের নাম করবে?"

"গল্পের বইয়ের নাম বলা বিষম ঝামেলার ব্যাপার। কোন্ বইটার কথা আগে বলব? যে বইটা আমার সবচেয়ে প্রিয় হয়তো সেটার নামই আমি বলতে ভুলে যাব।" তারপর ময়ূখ নিজেই বলল, "এখন যাঁদের লেখা পড়ি, তাঁদের অনেকের লেখাই আমার পছন্দ। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তু আর কাকাবাবু, বুদ্ধদেব গুহর ঋজুদা আর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্নেল আমার প্রিয় চরিত্র।"

ভবিষ্যতের কথা বলতে চাইছিল না ময়ূখ। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা দেখে সে জানাল, "ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই।"

আনন্দমেলা ময়ূখ নিয়মিত পড়ে, সব লেখাই তার পছন্দ। লেখাপড়া বিভাগটি সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে।

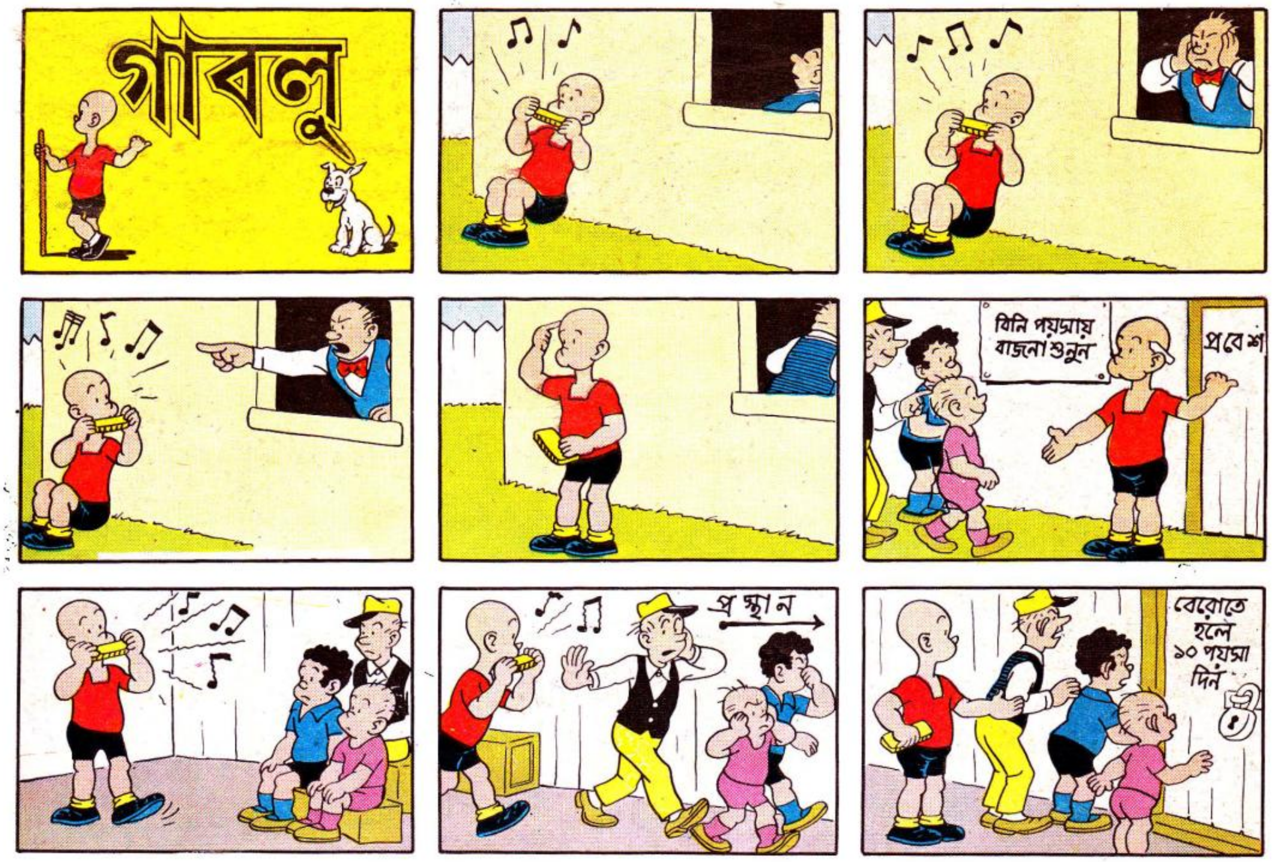
গাবলু
বিনি পয়সায় বাজনা শুনুন
প্রবেশ
প্রস্থান
বেরোতে হলে ১০ পয়সা দিন

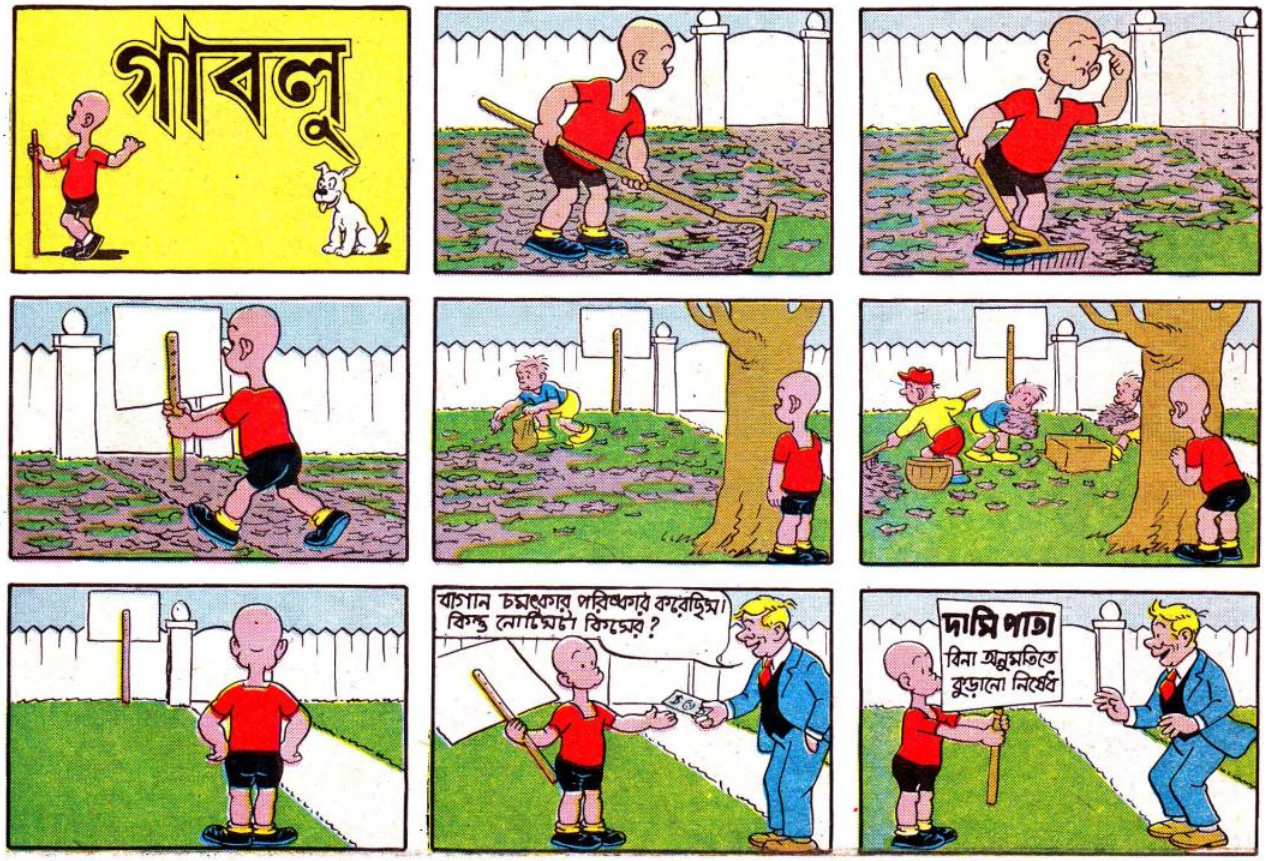
গাবলু
বাগান চমৎকার পরিষ্কার করেছিস। কিন্তু নোটিশটা কিসের?
দামি পাতা
বিনা অনুমতিতে কুড়ানো নিষেধ

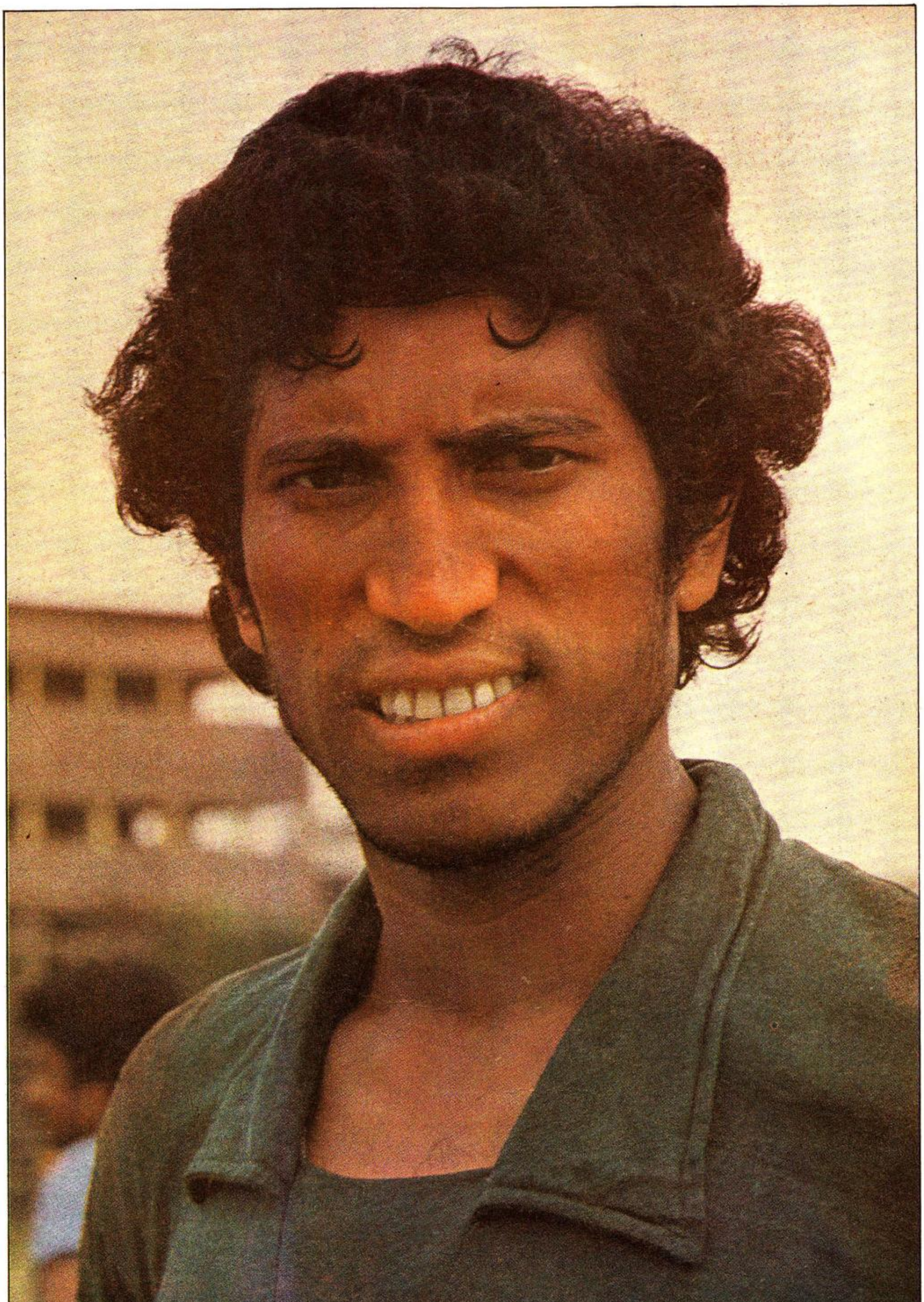

অতনু ভট্টাচার্য (পাতা ওলটালেই ফুটবলের খবর)

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

অতন্দ্র অতনু

নৃপতি চৌধুরী

ডাকনাম খিলু। বয়স ছাব্বিশ। উচ্চতা প্রায় ছ ফুট। বুকের মাপ ছত্রিশ। দেহের ওজন সাতষট্টি কে জি। গায়ের রঙ শ্যামলা। মাথার চুল কোঁকড়া। মাতৃভাষা বাংলা। এই পর্যন্ত পড়ার পরেই তোমরা নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছ—এই রে, আনন্দমেলার খেলার পাতায় বোধহয় নিরুদ্দেশ সম্পর্কিত একটা ঘোষণা ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে। না, না ভুল হয়নি। খিলুর পোশাকি নামটা শুনলেই বুঝবে হারিয়ে যাবার জন্যে নয়, দীর্ঘদিন ধরে মনে রাখার জন্যেই এঁকে আমাদের দরকার হবে। ছেলেটির নাম অতনু ভট্টাচার্য।

ক্লাব ফুটবল, রাজ্য ফুটবল ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে বারের নীচে সবসময় নির্ভরতা জুগিয়েছেন অতনু অনবদ্য গোলকিপিং করে। কী, এবার খুঁজে পেয়েছ তো ওপরের মানুষটিকে? হ্যাঁ, এই মুহূর্তে ভারতের তো বটেই, এশিয়ার সব-সেরা গোলকিপার অতনু ভট্টাচার্য এশিয়ান অল-স্টার টিমে নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমানে এশিয়ার ফুটবল-মানচিত্রে ভারতের পরিচিতি বিন্দুবৎ জায়গায় আবদ্ধ। এখন অতীত-রেকর্ড ছাড়া বোঝানো শক্ত একদা আমাদের মাথায় শোভা পেত এশিয়ার এক নম্বরের মুকুট!

এশিয়ার ফুটবলে এখন আমাদের অবস্থা যেন ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চে-বসা ছেলের মতো। ভাবতে সত্যিই আনন্দ হচ্ছে যে, সব-হারানো ভারতীয়দের মধ্যে থেকে এখনও একজন নিজের যোগ্যতায় এবং অধিকারে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ এগারোজনের দলে জায়গা করে নিয়েছেন। শাবাশ অতনু। এই দল যখন ইউরোপে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে যাবে তখন একজন ভারতীয়র কথা মনে করে আমরা সত্তর কোটি ভারতবাসী খুশিতে উপচে পড়ব।

গোলকিপিং ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে একটা আর্ট। দুর্জয় সাহস, লড়াই করার দুর্দমনীয় ইচ্ছে, ক্ষিপ্রতা, রিফ্লেক্স, টাইমিং এবং অভ্রান্ত অনুমানক্ষমতা ইত্যাদি শব্দগুলোর নিখুঁত মিশ্রণে গড়ে ওঠেন একজন আদর্শ গোলরক্ষক। চূড়ান্ত ভুল থেকে দলকে রক্ষা করতে হয় তাঁকেই। মাত্র কয়েক মিটার দূরে হানাদার ফরোয়ার্ডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশের সম্মান, ক্লাবের ঐতিহ্য কিংবা দলের পতন রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হয় গোলকিপারকে। অথচ গোলরক্ষকরা জানেন যে, দলের জন্য যে-কোনও খেলোয়াড়ের অনেক মারাত্মক ত্রুটিও চাপা পড়ে যায়, কিন্তু পরাজিত গোলরক্ষকের সামান্য দোষেরও কোনও ক্ষমা নেই। কর্মকর্তা, সমর্থকরা সেখানে কঠিন, কিছু ক্ষেত্রে নির্দয়।

এসব অসুবিধের কথা অতনু জানেন, বোঝেনও। তবু অদম্য উৎসাহে হাওড়া ইউনিয়ন, সালকিয়া ফ্রেন্ডস, বি এন আর, মোহনবাগান, মহমেডানে খেলতে খেলতে অনেক ওপরে উঠে এসেছেন অতনু। ভাস্কর, প্রতাপ, ব্রহ্মানন্দর বিশাল অস্তিত্ব ছাড়িয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ভারতীয় দলে। খেলেছেন মারডেকা ফুটবলে, প্রি-ওলিম্পিকে, এশিয়া কাপ, নেহরু কাপ, প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপে। এই সব টুর্নামেন্টের অনেক ম্যাচেই ভারত জঘন্য ফুটবল খেলেছে। কিন্তু বারের তলায় অতন্দ্র অতনুর 'ইলাস্টিক' হাত যখন গোলমুখী বলকে অবিশ্বাস্য দক্ষতায় রুখে দিয়েছে, তখন গ্যালারি গর্জে উঠেছে আনন্দে, বিস্ময়ে। শেষ পর্যন্ত অতনু এশিয়ান অল-স্টার টিমেও ডাক পেলেন। এই সম্মান এর আগে ভারত থেকে পেয়েছেন জার্নেল সিং, ইউসুফ খান, আলতাফ এবং ইন্দর সিং। অতনুই প্রথম গোলকিপার। এবং তার চেয়েও বড় ব্যাপার—তিনিই প্রথম বাঙালি।

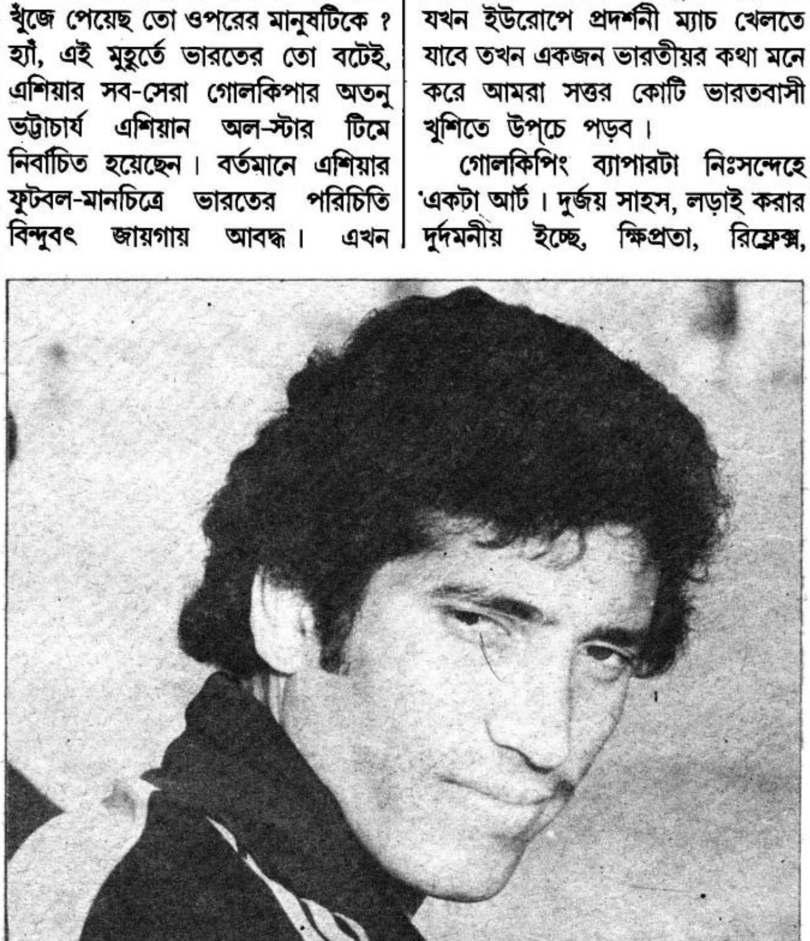

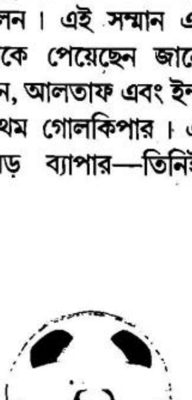

ইরাকের করিম আলভিকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাঁরই পাঠানো বল ঢুকছে কাতারের গোলে

ইরাক জিতল, ধিক্কার পেল কাতার

রাজা গুপ্ত

বিরাশির ঘটনা মনে পড়ছিল। দিল্লিতে এশিয়ান গেমসের ফাইনালে আলো-ঝলমল নেহরু স্টেডিয়ামে বসে শীতের রাতে হু-হু করে কাঁপতে কাঁপতে দেখেছিলাম, এই ইরাক দুর্দান্ত ফুটবল খেলে সোনা জিতেছিল কুয়েতকে হারিয়ে। আড়াই বছর পরে সেই ইরাক এবার বিস্মিত করে গেল কলকাতাকে। জয় ছাড়া প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপের গ্রুপ ওয়ান বি থেকে ওঠার আর কোনও রাস্তা ছিল না ইরাকের। ফুটবলে নিবেদিতপ্রাণ এগারোটি ইরাকি শুধু জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে মরিয়া হয়ে লড়ে গেল। এবং, বলা বাহুল্য, শেষপর্যন্ত সফল হল। জানি না, দেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টায় মরিয়া ইরাকিদের এই সর্বাত্মক প্রয়াসটুকু ভারতীয় ফুটবলারদের চোখ ফোটাবে কি না।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের চেয়েও বেশি রেষারেষি ছিল ইরাক-কাতারের মধ্যে। এই গুরুত্বপূর্ণ খেলাটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার পর থেকেই আমরা একইসঙ্গে দু-দেশের ছেলেমানুষি এবং সিরিয়াসনেস লক্ষ করে বিস্মিত হয়েছি। এই ম্যাচের জন্যে নির্বাচিত ভারতীয় রেফারি মেলভিন ডি'সুজাকে বদল করাল ইরাক, প্রভাবিত হবার আশঙ্কায়। ইংল্যাণ্ড থেকে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে ম্যাচ পরিচালনা করতে তড়িঘড়ি উড়ে এলেন ব্রিটিশ রেফারি জর্জ কোর্টনি। ওদিকে কাতার তার প্লেয়ারদের সুস্থ রাখার ব্যাপারে এতটাই সতর্ক ছিল যে, ভারতীয় রান্না পর্যন্ত তারা খেতে অনাগ্রহী ছিল। তারা খাবার আনিয়েছে সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলও তারা প্রায় অর্ধেকটাই বুক করে নিয়েছিল স্রেফ থাকার জন্যে। দু'দলের ছেলেমানুষি চোখে পড়েছে, যখন জার্সির রং এক হয়ে যাওয়ায় কোনও পক্ষই জার্সি বদল করে খেলতে চায়নি।

কড়া ম্যান-মার্কিং আর হার্ড ট্যাকলের বহর দেখে শুরুতেই বোঝা যাচ্ছিল, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়তে কেউই রাজি নয়। প্রথমার্ধের একুশ মিনিটের মাথায় ওভার-ল্যাপে উঠে-আসা রাইট ব্যাকের আপাত-নিরীহ চিপটি লক্ষ করে ছুটছিলেন ইরাকি স্ট্রাইকার আহমদ রবি। পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে উঁচু হয়ে-আসা বলটি ধরতে এগিয়ে এলেন কাতারের গোলরক্ষক ইউনিস আহমেদ ল্যারি। কিন্তু গোলরক্ষক বল ধরার ঠিক আগের মুহূর্তে লাফিয়ে উঠলেন রবি। লাফালেন কাতারের এক স্টপারও। সবার উঁচুতে রবির দীর্ঘ মাথা ছিটকে উঠে বলের নাগাল পেল এবং পলকে পরিবর্তিত হয়ে গেল বলের গতিপথ। বিমূঢ় ইউনিস আহমেদের মাথা টপকে বল জড়িয়ে গেল জালে। অবশ্য বিরতির মিনিট-দুই আগে গোল শোধ করে কাতার। গোলের মুখে ভাসানো সেণ্টার বুকে রিসিভ করে মাটিতে নামিয়ে ভলি মারলেন আলি মহম্মদ। ইরাকের অধিনায়ক গোলরক্ষক ঝাঁপিয়ে পড়ে গোল বাঁচালেন বটে, কিন্তু বল ছিটকে গেল তাঁর হাত থেকে। বলটাকে আগাগোড়া ফলো করে ছুটে আসছিলেন মনজুর মুফতা। সামান্য সুযোগে ছোঁ মেরে বাঁ পায়ে গোল করে গেলেন মনজুর। গোলটা যেন চার্জ করে দিল ইরাকিদের। বন্যার মতো আক্রমণ আছড়ে পড়ল কাতার ডিফেন্সে। অবশেষে এল সেই দর্শনীয় গোল। জটলার মধ্য থেকে ইরাকের একজন খেলোয়াড় শট নিলে গোল লাইন থেকে ফিরিয়ে দেন কাতারের লেফ্‌ট স্টপার। ফিরতি বলে আবার শট। বল ক্রস-পিসে লেগে ছিটকে ওঠার মুখে করিম আল্‌ভি শূন্যে শরীর ভাসিয়ে চমৎকার ব্যাকভলিতে বল পাঠালেন নেটে। অনবদ্য গোল। এরপর অবশ্য কাতারের আর বিশেষ কিছু করার ছিল না।

না, এইখানে একটু ভুল বলা হল। এরপরে কাতার যে কাণ্ডটা করল, সেটার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা রে-রে করে তেড়ে গেল ইরাকিদের দিকে। এবং মারপিট দাঙ্গা বাধিয়ে ক্রীড়াঙ্গনকে রণাঙ্গন বানিয়ে তুলল পলকে। এইটুকু তারা না করলেই শোভন হত। খেলার মাঠে যারা হার মেনে নিতে পারে না, বোঝা যায়, খেলার আসল আনন্দ এবং মাধুর্যটুকু তারা ঠিকভাবে নিতে শেখেনি।

বিদায়, মারি কানাইয়ান

সুজয় সোম

বড় মাপের, বড় জাতের ফুটবলার ছিলেন। পদ্মোত্তম বেঙ্কটেশের পর, প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে, সময়টা মারি কানাইয়ানের। পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি হাইট, আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রঙ, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, অসম্ভব স্পিডের উইঙ্গার। রাইট উইংয়ে খেলতেন সাধারণত। লেফট উইংয়েও সমান চৌকশ। মাঠের টাচ লাইনটা ব্যবহার করতেন দারুণভাবে। শার্প ইনসাইড কাট করেও ভেতরে ঢুকতেন। কলকাতা তাঁর নাম দিয়েছিল 'বেবি-ট্যাক্সি'। ১০.৯ সেকেণ্ডে একশো মিটার ছুটতেন।

কানাইয়ানের জন্ম ১৯৩১ সালে। বাঙ্গালোরের গোকাদপালোয়ম বয়েজ স্কুলে ক্লাস ফাইভের ছাত্র যখন, জোরকদমে ফুটবল খেলার শুরু। '৪৪ থেকে '৪৯ সাল বাঙ্গালোর স্টুডেন্টস ক্লাবে দাপটের সঙ্গে খেলে '৫০ সালে ডাক পেলেন কলকাতায়। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। পঞ্চাশের দশকের বাকি নয় বছর খেললেন রাজস্থানে। '৬০ সালটা ইস্টবেঙ্গলে, '৬১-'৬২ মহামেডানে কাটিয়ে ফিরে গেলেন নিজের শহরে। '৫২ থেকে '৫৭, টানা ছ-বার ছিলেন জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলের মস্ত ভরসা। এর মধ্যে '৫৩ ও '৫৫ সালে সন্তোষ ট্রফি জিতেছিলেন কলকাতার ফুটবলাররা। রাশিয়া সফর ছাড়াও, '৫৫ সালেই ঢাকায় কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান মহম্মদ আজিজের ভারতীয় দলে ছিলেন তিনি। পরের বছর মেলবোর্ন ওলিম্পিকে চতুর্থ স্থান পাওয়া বদ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত দলে, '৫৭ সালে দূর প্রাচ্য সফরেও। '৫৮ সালে ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে খেলতে গেছিলেন ব্রহ্মদেশে। '৬০ সালের রোম ওলিম্পিকে স্ট্যাণ্ড বাই। দেশের মাটিতেও সুদান, বালগারিয়া, হাঙ্গারি বা চিনের সঙ্গে প্রদর্শনী ফুটবলে তাঁর চোখ-ধাঁধানো খেলা এখনও অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আর হ্যাঁ, '৫৬-তে বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপে খেলেছিলেন মোহনবাগান দলে। ফুটবল থেকে রিটায়ার করলেন '৬৮ সালে।

বড় মনেরও মানুষ ছিলেন। কম কথা বলতেন। সব সময়েই হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। রসে টইটম্বুর। যে-কোনও থমথমে পরিবেশকে অনায়াসে হালকা করে দিতে পারতেন। অদ্ভুত এক শখ ছিল তাঁর। শাড়ি পরে মেয়ে সাজা। মেয়েদের অনুকরণ করতে পারতেন চমৎকার।

ফুটবল ছাড়ার পর চাকরি নিলেন ভারতীয় বিমান 'ফাইটার' তৈরির কারখানায়। হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স ল্যাবোরেটরিতে। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছেন জীবনভর। সেই আমলে সামান্য টাকা রোজগার হত ফুটবল খেলে। লোভনীয় চাকরিও জোটেনি। হঠাৎই অসুস্থ হলেন একদিন, স্ট্রোক থেকে পক্ষাঘাত, বাঙ্গালোরের বিবেকনগরে এগিপুরা কলোনির ভিমান্না লেনের ভাঙাচোরা এগারো নম্বর বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী, চার ছেলে-মেয়ের জীবনে নেমে এল চরম দুর্দিন।

'৮৪ সালে জুন মাসে তাঁর এই দুরবস্থার কথা জানতে পারলেন কলকাতার এক ক্রীড়া-সাংবাদিক। তাঁর দুঃখ, বেদনা, দুর্দশা ঘিরেই শৈলেন মান্নার নেতৃত্বে কলকাতার প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলারদের নিয়ে গঠিত হল ফুটবলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। '৮৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রোদ-ঝলমল বিকেলে মোহনবাগান মাঠে দুই প্রদর্শনী ম্যাচে চার প্রজন্মের বিখ্যাত ফুটবলারদের হালকা মেজাজের রোমাঞ্চকর খেলা বেজায় উপভোগ করল কলকাতা। খেলার শেষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যখন তাঁর হাতে তুলে দিলেন ৩০,০৫১ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট, কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। কথায় কথায় জ্যোতিবাবু বলেছিলেন, "এটা কোনও দান বা দয়া নয়। শ্রদ্ধার্ঘ। নিজের যোগ্যতায় ফুটবল ও দেশকে সেবা করেছেন তিনি। ঋণমুক্তির সামান্যতম চেষ্টা আমাদের।"

আমরা কানাইয়ানের দীর্ঘজীবন কামনা করেছিলাম। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক বেনিফিট ম্যাচের ২১৪ দিন পরেই, '৮৫ সালের ১৬ এপ্রিল, মঙ্গলবার দুপুরবেলা আচমকা তাঁর মৃত্যু হল।

'তেতো' রসগোল্লা

অশোক রায়

ধরো, বেশ চনমনে খিদের মুখে একটি প্লেটে বেশ বড় সাইজের দুটি রসগোল্লা এনে তোমাকে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, এই ক্ষেত্রে ম্যাজিক না জেনেও তোমাদের মধ্যে যে-কেউ ওই রসগোল্লা দুটিকে দ্রুত 'ভ্যানিশ' করাতে হঠাৎ পি· সি· সরকার হয়ে যেতে পারো। আসলে, মিষ্টি রসগোল্লার আকর্ষণ এমনই। কিন্তু জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে দু-ইনিংসে দুটি রসগোল্লা করলে তার স্বাদ কিন্তু 'তেতো' ঠেকবেই। হ্যাঁ, জীবনের প্রথম টেস্টেই এই রকম তেতো রসগোল্লার স্বাদ পেয়েছেন নিউজিল্যাণ্ডের উনিশ বছরের তরুণ ওপেনার কেন রাদারফোর্ড। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কুইন্স পার্কে চলতি সিরিজের প্রথম টেস্টে রাদারফোর্ড প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে দু-ইনিংসেই আউট হয়েছেন শূন্য রানে। কী বিচ্ছিরি কাণ্ড বলো!

শূন্য রানের চশমা পরাকে ক্রিকেটের পরিভাষায় বলা হয় 'পেয়ার'। এর মধ্যে আবার দু-ইনিংসেই প্রথম বলে আউট হওয়াকে বলে 'কিং-পেয়ার'। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে জীবনের প্রথম টেস্টেই এইভাবে শূন্য রানের চশমা পরার ঘটনা ঘটেছে আরও কুড়ি বার। এর মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডেরই রয়েছেন ছ' জন ক্রিকেটার। এঁদের বলতে পারো ব্রাদারস অব রাদারফোর্ড।

জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই এই 'পেয়ার' করার দুর্ভাগ্য প্রথম বরণ করেন ইংল্যাণ্ডের জি· এফ· গ্রেস ১৮৮০ সালে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। এর পরে অবশ্য ইংল্যাণ্ডের পক্ষে আরও দু' জন আবির্ভাবেই শূন্য রানের চশমা পরেছেন টেস্ট ক্রিকেটের আসরে। শুরুতেই জোড়া-গোল্লার নজির দক্ষিণ আফ্রিকার আটজনের। এঁদের মধ্যে টি· এ· ওয়ার্ড হলেন পৃথিবীর একমাত্র ক্রিকেটার যিনি আবির্ভাবেই করেছিলেন 'কিং পেয়ার' (মানে দু' ইনিংসেই প্রথম বলে আউট)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এমন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন মাত্র একজন করে ক্রিকেটার। এঁরা হলেন যথাক্রমে আলফ ভ্যালেনটাইন (বঃ ইংল্যাণ্ড) ও মাইক হুইটনি (বঃ ইংল্যাণ্ড)। মজার কথা, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার কোনও ক্রিকেটার এখনও পর্যন্ত জীবনের প্রথম টেস্টেই এমন ব্যর্থতার মুখোমুখি হননি।

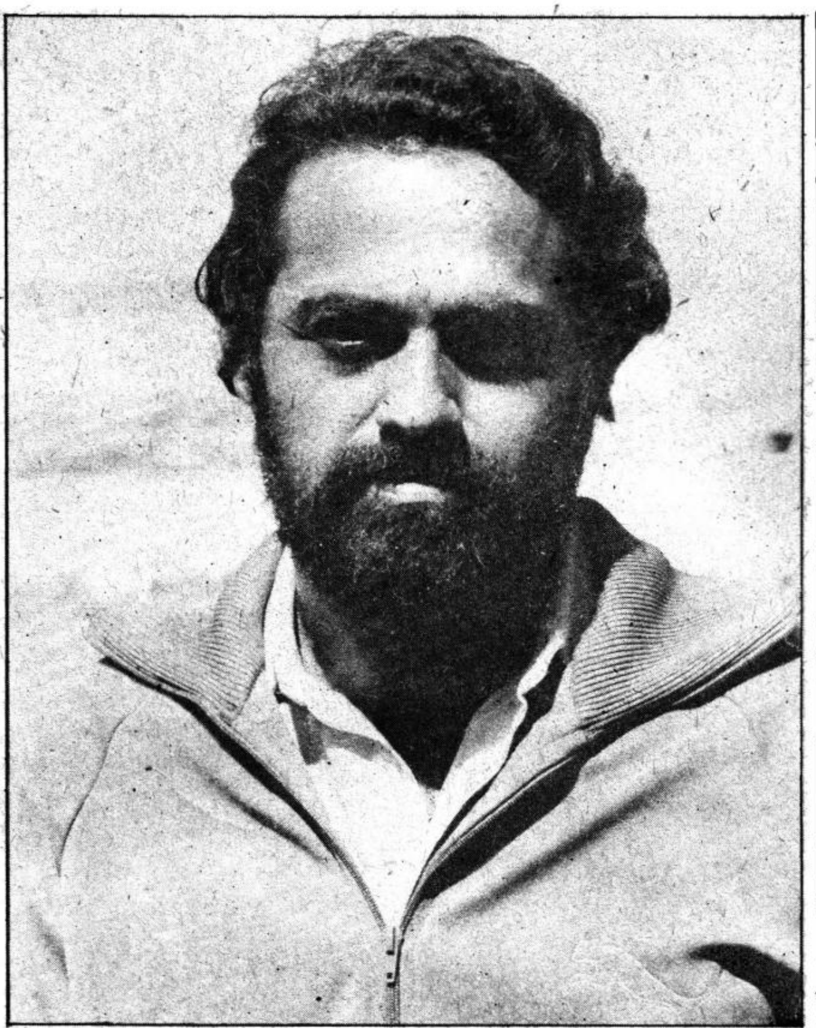

'বল লাগিয়ে ব্যাট নোংরা করা পছন্দ করি না'—চন্দ্রশেখর

এবার আসা যাক ভারতের কথায়। ভারতের পক্ষে টেস্ট জীবনের শুরুতেই জোড়া-গোল্লার খপ্পরে পড়েন জি· এস রামচাঁদ (বঃ ইংল্যাণ্ড, ১৯৫২) এবং মনিন্দর সিং (বঃ পাকিস্তান, ১৯৮২-৮৩)। ভারতের পক্ষে যে-সব ব্যাটসম্যান বিভিন্ন সময়ে নিজস্ব টেস্ট কেরিয়ারে জোড়া-শূন্যের ফাঁদে আটকে পড়েছেন তাঁরা হলেন হাজারে, গাদকারি, ইঞ্জিনিয়ার, জয়সীমা, যোশি, পঙ্কজ রায়, সারদেশাই, তামানে, বেঙ্গসরকর, যশপাল শর্মা, বিনি, রমাকান্ত দেশাই, সুরেন্দ্রনাথ, দোশি, প্রসন্ন, বেঙ্কটরাঘবন, মহিন্দর অমরনাথ, বেদী এবং চন্দ্রশেখর। শেষ তিনজন সম্পর্কে আলাদা করে একটু বলার আছে। মহিন্দর 'পেয়ার' করেছেন দু'বার, বেদী তিনবার এবং চন্দ্রশেখর চারবার। চারবার 'পেয়ার' করার নজির (একবার আবার কিং পেয়ার) পৃথিবীতে আর কোনও ক্রিকেটারের নেই। বলতে পারো, জোড়া-শূন্যের কেরামতিতে একটা বিচ্ছিরি বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলেছেন চন্দ্রশেখর। বিরাট মাপের বোলার চন্দ্রশেখর সম্পর্কে বোধহয় সেই কারণেই বলা হত, 'চন্দ্রার ব্যাটে একটা মস্ত ফুটো আছে।' শুধু 'পেয়ার' নয়, 'শূন্য' সংগ্রহের বিশ্বরেকর্ডটাও রয়েছে চন্দ্রার ঝুলিতে। বিশ্বরেকর্ড দুটির কথা তুললেই চন্দ্রাও ঠাট্টার সুরে জবাব দিতেন, "কী করব বলো, বল লাগিয়ে ব্যাট নোংরা করা আমি যে পছন্দ করি না!"

পেলে যখন গোলকিপার

সম্রাট রায়

কলকাতা মাঠে ফুটবল এসে পড়েছে। তোমরা যারা ফুটবল-পাগল তারা তো ইতিমধ্যেই প্রিয় দলের খেলা থাকলে হয় বাবা-কাকার হাত ধরে মাঠে নয়তো একা-একাই রেডিওতে কান পাততে শুরু করেছ। এই বছরের কলকাতা ফুটবল এখন সবে শুরুর মুখে।

ফুটবলের প্রসঙ্গ উঠলেই ফুটবল-সম্রাট পেলের কথা কেন জানি না মনে পড়ে যায়। তোমাদেরও হয়তো মনে আছে ১৯৭৭ সালে কসমস ক্লাবের হয়ে পেলে কলকাতায় খেলে গিয়েছিলেন। ফুটবল সিজনের শুরুতেই সেই বিখ্যাত পেলেকে আর একবার তোমাদের সামনে হাজির করছি, তবে অন্য রূপে, অন্য ভূমিকায়।

ফরোয়ার্ড পেলের কথা তোমরা জানো। চোখ-জুড়ানো দু'পায়ের কাজে কত বিস্ময়কর গোল করেছেন তিনি। ফুটবল কেরিয়ারে খুব কম করেও হাজারটা গোল তিনি করেছেন। কিন্তু জানো কি, অমন দুর্ধর্ষ ফরোয়ার্ডকে একবার গোলকিপারের ভূমিকায় মাঠে নামতে হয়েছিল ? কথাটা কি অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ?

স্যান্টোসের হয়ে পেলে খেলছেন অ্যালগারোর বিপক্ষে, যথারীতি ফরোয়ার্ডের ভূমিকায়। সেমি-ফাইনাল ম্যাচ। শুরুর হুইস্‌ল্‌ বাজার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পেলে একটা চোখ-ধাঁধানো গোল করলেন। প্রায় মাঝ-মাঠ থেকে বল ধরে বিপক্ষের জনা-ছয়েক ডিফেণ্ডারকে ধোঁকা দিয়ে লম্বা ছুটে পেলে পৌঁছে গেলেন বিপক্ষ গোলকিপারের মুখোমুখি। তারপর যে কাণ্ডটা করলেন তাকে প্রায় ম্যাজিকই বলা যায়। চলতি বলটাকে পায়ের চেটো দিয়ে তুলে প্রথমে হাঁটুতে, সেখান থেকে মাথায়, তারপর আলতো হেডে বল ঠেলে দিলেন সামনের দিকে। পড়তি বল মাটি ছোঁওয়ার আগে বাঁ-পায়ে কামান-দাগা শট। বল বিমূঢ় গোলকিপারের পাশ দিয়ে সোজা নেটে। বল পায়ে ধরা থেকে গোল করা পর্যন্ত পেলের সময় লেগেছিল মাত্র সাতাশ সেকেণ্ড ! এই গোলটি সম্পর্কে পরে কাগজে বেরিয়েছিল : 'সার্কাসের স্টাইলে জাদুকরের গোল'।

এই গোলের পরে পেলে আরও একটা দর্শনীয় গোল করলেন। কিন্তু তারপরই ঘটল সেই দুর্ঘটনা। দলের নির্ভরযোগ্য গোলকিপার গিলমোর মারাত্মক চোট পেলেন। স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল গোলকিপার গিলমোরকে। দু'গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় স্যান্টোস দল পড়ল মহা ফাঁপরে। এখন কে খেলবেন গোলে ? অবস্থা সামলাতে পেলে খুলে ফেললেন নিজের বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সি। এবং গায়ে চাপালেন গোলকিপারের ১ নম্বর জার্সিটি। দর্শকরা কিন্তু চাইছিলেন পেলে তাঁর নিজের পজিশনেই খেলুন। কারণ তাঁরা জানতেন পেলেবিহীন স্যান্টোসের আক্রমণ দুর্বল হতে বাধ্য। আর ঠিক এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চাইল অ্যালগারো দল। মরিয়া হয়ে তারা গোল লক্ষ করে একের পর এক আঘাত হানতে আরম্ভ করল। অনভ্যস্ত গোলকিপার পজিশনে দাঁড়িয়েও পেলে প্রাণপণ খেললেন। এমনকী একটা নির্ঘাত গোলও বাঁচালেন ডাইভ দিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনটি গোল তাঁকে হজম করতে হয়েছিল।

এই লেখাটা এইখানেই শেষ করে দিলে তোমরা নির্ঘাত ভাববে ইশ্‌, পেলে এত খেললেন কিন্তু টিমটা বাঁচল না ! আবার বলছি ঘাবড়াও মত্‌। স্যান্টোস শেষ পর্যন্ত এই খেলায় জিতেছিল ৪—৩ গোলে। কী, রেজাল্ট জেনে এবার খুশি তো ?

আহ্, কি দারুণ অনুভূতি!
PONDS
Pond's
Dreamflower Soap
তরতাজা থাকার অনুপম
সুখানুভূতির মুহূর্তগুলি
আবেশঘন হয় নতুন পণ্ডস্
ড্রীমফ্লাওয়ার সাবান মেখে
স্নানের পরে...এ যে তাজা
ফুলের সুগন্ধে ভরপুর। আহ্ কি
দারুণ অনুভূতি!
নতুন
পণ্ডস্
ড্রীমফ্লাওয়ার সাবানে

ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমকটিকে !
सुपर
रिन
सफ़ेदी की चमकार
RIN
সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক...
অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন